Contents

আল্লামা সাইয়েদ মুহিব্বুদ্দীন আল-খতীব

শিয়া-সুন্নী ঐক্য প্রসংগ

অনুবাদঃ আবদুশ শাকুর খন্দকার

Contents

শিয়া–সুন্নী ঐক্য প্রসংগ

মূলঃ আল্লামা সাইয়েদ মুহিব্বুদ্দীন আল–খতীব
অনুবাদঃ আবদুশ শাকুর খন্দকার

প্রকাশনায়ঃ

কাওসার পাব্লিকেশান্স
বাংলাবাজার,ঢাকা–১১০০

প্রথম প্রকাশঃ

শা'বান ১৪১০ হিজরী
মার্চ ১৯৯০ খৃষ্টাব্দ

মুদ্রণেঃ

মদীনা প্রিন্টার্স
বাংলা বাজার
ঢাকা–১১০০

মূল্যঃ বিশটাকা মাত্র

ON SHIA-SUNNI UNITY. Translated into Bengali by Abdus Shakoor Khandaker from original in Arabic 'Al-Khutut Al-Aridhah' by Allama Sayyed Muhibbuddin Al-Khateeb and published by. Kawsar Publication Dhaka, Bangladesh. First Edition: March 1990 C.E.
Price . Taka Twenty only.

সূচীপত্রঃ

মুখবন্ধ

আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করে আসছি যে, দ্বাদশ ইমামপন্থী শিয়া মযহাবের পক্ষ থেকে তথাকথিত 'শিয়া–সুন্নী ঐক্য' প্রতিষ্ঠার নামে বিভিন্ন সুন্নী দেশে শিয়াবাদকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ব্যাপক প্রচার কার্য চালানো হচ্ছে। এখন থেকে অর্ধশত বছর পূর্বে আন্তর্জাতিক শিয়া নেতৃত্ব তথাকথিত শিয়া– সুন্নী নৈকট্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য মিসরে প্রথম প্রচার কেন্দ্রটি স্থাপন করার সময় থেকেই একটি শক্তিশালী শিয়ারাষ্ট্র পরোক্ষভাবে এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত রয়েছে এবং যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে এসেছে। এক দশক পূর্বে ইরানে সংঘটিত রাষ্ট্র বিপ্লবের পর শিয়া–সুন্নী ঐক্য আন্দোলনে নতুন প্রাণ ও গতি সঞ্চারিত হয় এবং মিসরের বাইরে অন্যান্য সুন্নী দেশেও এ আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করে। বিগত বছরগুলোতে যেসব সুন্নী দেশে এ শিয়া আন্দোলনটির কাজ খুব জোরেশোরে চলছে তন্মধ্যে বাংলাদেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখ্য, ইসনা আশারিয়া ইমামিয়া শিয়া মযহাব ও আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াতের মধ্যে তথাকথিত নৈকট্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে ত্রিমুখী তৎপরতা চালানো হচ্ছে। প্রথমতঃ, শিয়া মযহাব সম্পর্কে আমাদের দেশের সরলপ্রাণ সুন্নী মুসলমানদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের সম্মুখে এর ভুল সংজ্ঞা তুলে ধরা হচ্ছে এবং আমাদের সলফে সালেহীন ও পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম যে শিয়া ফিরকা সমূহকে বাতিল ফিরকা হিসেবে গণ্য করে গেছেন এ সত্যকে চাপা দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ শিয়া মতবাদকে এদেশের জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য অত্যন্ত সুচতুরভাবে একথা প্রচার করা হচ্ছে যে, 'হানাফী– শাফেয়ী– হাম্বলী' প্রভৃতির মত শিয়াবাদও ইসলামে একটি প্রচলিত মযহাবের নাম এবং শিয়ারা আকীদা ও আমলের দিক থেকে হানাফীদের অত্যন্ত নিকটবর্তী। এসব প্রচারণা যে আসলে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয় তা এ পুস্তকের পাতায় পাতায় আপনারা দেখতে পাবেন। তৃতীয়তঃ, শিয়া–সুন্নী সম্প্রীতি, ইসলামী বিপ্লব ইত্যাদি চটকদার শ্লোগানের মাধ্যমে শিয়া মতবাদের প্রতি সুন্নী মুসলমানদের সহানুভূতি অর্জন এবং ইসলামের নামে পরিচালিত একটি শিয়া রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও সহিংসতার প্রতি বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমর্থন আদায়ের এক অশুভ পাঁয়তারা চালানো হচ্ছে।

শিয়া ও সুন্নী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন এবং শিয়া মযহাব ও আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াতের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা আসলে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। বলা

বাহুল্য, প্রথমটি অভিপ্রেত এবং কল্যাণকর কিন্তু দ্বিতীয়টি নিঃসন্দেহে অনভিপ্রেত এবং ক্ষতিকর। শিয়া কেন অন্য যেকোন ধর্ম বা মতবাদের অনুসারীদের সংগে মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন ইসলামে শুধু অনুমোদিত নয়– প্রশংসিতও। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, শিয়াদের তাতে মোটেই আগ্রহ নেই। সুন্নীদের সংগে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের চেয়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াতের সাথে ধর্মীয় ঐক্য স্থাপনেই শিয়াদের উৎসাহ বেশী। অবশ্য এজন্য তারা কানাকড়ি মূল্য দিতেও রাজী নয়। তারা চায় যে, আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাহ ও সলফে সালেহীনের তরীকা তথা ইসলামের মূলধারার সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমরা তাদের মতবাদের সংগে একাত্মতা ঘোষণা করি। কিন্তু আমরা কি তা করতে পারি? কোন ধর্ম বা মতবাদের সংগে ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমরা কি আমাদের দ্বীন পরিত্যাগ করতে পারি? ইসলাম কি আমাদের কোন ব্যাক্তিগত সম্পত্তি যে একে নিয়ে আমরা খেলা করব?

শিয়া মতবাদ ও আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াতের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র ও ইসলামে একটি নতুন ফিত্না। কিন্তু এ ফিত্না দ্বারা শিয়াদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার কোন আশংকা নেই। কারণ, শিয়া মতবাদ নিজেই ইসলামে একটি ফিত্না। মুহাদ্দিসীন ও মুজতাহিদীনে কেরাম শিয়াবাদকে ইসলামে নতুন উদ্ভাবিত একটি বাতিল ফিরকা বলে গণ্য করেছেন। এ ফিরকা উদ্ভাবনের মাধ্যমে তারা ইসলামের মূলধারা–আহলে সুন্নাহ ওয়াল জমায়াহ–থেকে দূরে সরে গেছে। এখন তারা চাচ্ছে আমাদেরকেও এ ধারা থেকে সরিয়ে নিয়ে তাদের সাথে একই সমতলে দাঁড় করাতে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তারা তথাকথিত শিয়া–সুন্নী ঐক্যের শ্লোগান তৈরী করেছে। ঐক্যের প্রতি আহ্বানে তারা যদি আন্তরিক হতো তবে কি তারা আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরাম, ইসলামের পবিত্রস্থান ও পথিকৃতদের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারত? তবে তারা যা–ই ভাবুক বা করুক না কেন আমরা তাদের সংগে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে প্রস্তুত।

কিন্তু একটি শিয়া রাষ্ট্রের পৃষ্টপোষকতা ও বদান্যতায় বাংলাদেশে শিয়া মতবাদের সমর্থনে ও আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াতের সমালোচনায় যে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হচ্ছে তা দেখে বিশ্বাস হয়না যে, তারা সুন্নীদের সংগে শান্তি ও ঐক্য চায়। একটি বাতিল ফিরকার স্বার্থে কুরআন–হাদীসের অপব্যাখ্যা করা ও সাধারণ মুসলমানদের আকীদা– বিশ্বাসের উপর বেপরোয়াভাবে আক্রমণ পরিচালনা করা সত্যিই অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। বলা বাহুল্য, শিয়াদের উদ্যোগ ও অর্থে পরিচালিত এসব কার্যকলাপ প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে একটি

সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। আমাদের উলামা, মাশায়েখ ও পীর-মুর্শিদগণের উচিত পূর্বাহ্নেই ষড়যন্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমান বিশেষতঃ যুবসমাজকে এর খপ্পর থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বাতিল ফিরকাসমূহের আলোচনা শুধু হাদীস, তফসীর ও আকাইদের কিতাবসমূহে সংরক্ষিত থাকলেই চলবেনা বরং সভা-সম্মেলনে ওয়াজ মহফিলে এবং জুমার খুৎবাতেও অন্যান্য বিষয়ের সংগে এ বিষয়টি আলোচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

উল্লেখ্য যে, মিসরীয় পন্ডিত আল্লামা মুহিবুদ্দিন আল-খতীব বর্তমান শতকে শিয়া মযহাব সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক ও বিশিষ্ট গ্রন্থকার হিসেবে পরিচিত। গ্রন্থ প্রণয়ন ছাড়াও শিয়া মতবাদ সম্পর্কে তিনি পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এ বইটি ইসলামী বিশ্বে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রথম প্রকাশের পর বিগত তিনদশকে এর ডজন খানেক সংস্করণ এবং একাধিক ভাষায় এর অনুবাদই গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। বিশেষতঃ এর দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভূক্ত 'নজফ সম্মেলন বইটির মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। ঐতিহাসিক নজফ সম্মেলনের সভাপতি ও বিচারক আল্লামা আবদুল্লাহ আল- সুয়াইদী (রহঃ) তাঁর স্মৃতিকথায় সম্মেলন সম্পর্কে যেসব তথ্য লিপিবন্ধ করে গেছেন তা যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি জ্ঞান সমৃদ্ধ ও চিন্তা উদ্দীপক। বিশেষতঃ নাদির শাহের দরবার ও শিয়া নেতা মোল্লা বাশীর সংগে কথোপকথনের যে চিত্র তিনি স্মৃতিকথায় তুলে ধরেছেন তা যেকোন নাটক-উপন্যাসের বর্ণনা ও সংলাপের মতই আকর্ষণীয়। দেরীতে হলেও গ্রন্থটির পূর্ণাংগ বংগানুবাদ এদেশের সুন্নী জনগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের উপহার দেওয়ার জন্য এ বইটি অনুবাদ করে আমার একান্ত স্নেহভাজন ছাত্র আবদুশ শাকুর খন্দকার দ্বীন ও মিল্লাতের প্রতি একটি বিরাট খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। আল্লাহতায়ালা তাঁর এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে উপকৃত হবার তৌফীক দিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সাধারণ পাঠকবর্গের মত আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষিত সমাজ, এমনকি উলামায়ে কেরামও এর দ্বারা সমভাবে উপকৃত হবেন। আমি বইটির বহুল প্রচার এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা কামনা করি। আমীন।

উবায়দুল হক
খতীব,
জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।
প্রাক্তন হেড মওলানা, মাদ্রাসা আলিয়া, ঢাকা।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা রব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আশরাফুল মুরসালীন সাইয়েদেনা মুহাম্মদ (সঃ) –এর উপর এবং তাঁর সকল বংশধর, সাথী ও অনুসারীর উপর।

পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও জনপদে বিগত বেশ কয় বছর যাবৎ শিয়া ইমামিয়া ইসনা আশারিয়া বা দ্বাদশ ইমামপন্থী শিয়া মযহাব এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াতের মধ্যে নৈকট্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শিয়াদের পক্ষ থেকে সুপরিকল্পিত প্রচারকার্য চালানো হয়ে আসছে। গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী এসব শিয়া প্রচারণার প্রতি ইদানীংকালে যেসব পন্ডিতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে তন্মধ্যে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রসিদ্ধ মিসরীয় লেখক সাইয়েদ মুহিব্বুদ্দীন আল খতীবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অত্যন্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সংগে, প্রজ্ঞা ও যুক্তির আলোকে এবং সর্বোপরি ইমামিয়া শিয়াদের মৌলিক গ্রন্থাবলীর ভিত্তিতে রচিত এ পুস্তকটিতে তিনি শিয়া–সুন্নী ঐক্যের প্রশ্নটি রীতিমত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। কষ্টসাধ্য এ গবেষণা কর্মের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে তাঁর কাছে সুস্পষ্টভাবে যে সত্যটি ধরা পড়ে তা এই যে, শিয়া–সুন্নী নৈকট্যের বিষয়টি ধারণা হিসেবে যতই চমৎকার হোকনা কেন, বাস্তবক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কারণ, শিয়া মতবাদের মূলনীতিসমূহ যাঁরা প্রণয়ন করেছেন তাঁরা তাঁদের মযহাবে পরবর্তীকালে উপলব্ধ এ ঐক্যের কোন পথই খোলা রাখেননি। তাঁরা তাঁদের মযহাবের ভিত্তি স্থাপন করেছেন এমন সব আকীদার উপর যেগুলো রসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক আনীত এবং সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক প্রচারিত আকীদা সমূহের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বস্তুতঃ, নবী করীম (সঃ) তাঁর অনুসারীদের এমন সরল–সঠিক উজ্জ্বল পথের উপর রেখে গেছেন যে, এ থেকে বিচ্যুত হবার অর্থ নিশ্চিত ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ পুস্তকটি প্রকৃতপক্ষে এমন একটি গবেষণা কর্ম যার উপাদানসমূহ সংগৃহীত হয়েছে দ্বাদশ ইমামপন্থী শিয়া মযহাবের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী থেকে। এতে উল্লেখিত উদ্ধৃতিসমূহই একথার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। উদ্ধৃতিসমূহে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠা নম্বর

ও মুদ্রণকালের বিবরণ এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদান করা হয়েছে যে, এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে কারো মনে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারে না। তাই আমরা মনে করি, গবেষণামূলক এ পুস্তকটি সকলের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের একটি পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য। যেন, যে রক্ষা পেতে চায় সচেতনভাবেই রক্ষা পায়, আর যে ধ্বংস হতে চায় জেনে-শুনেই ধ্বংস হয়। আলাহ তায়ালাই হিদায়াত প্রাপ্তদের একমাত্র অভিভাবক।

মুহাম্মদ নাসীফ

জেদ্দা, ১৪ রজব, ১৩৮০ হিঃ

বিঃ দ্রঃ—শায়খ মুহাম্মদ নাসীফ সউদী আরবে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর বর্তমান মহাসচিব ডঃ আবদুল্লা ওমর নাসীফের পিতামহ।

Contents

অনুবাদকের কথা

মযহাবী ইখতিলাফ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা মোটেই আমাদের পছন্দনীয় কোন কাজ নয়। কিন্তু আমাদের ধর্মীয় আকীদা ও বিশ্বাসের ভিত নাড়িয়ে দেওয়া এবং যে সত্য দ্বীনের পতাকাতলে আমরা অবস্থান করছি তা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেউ যদি আমাদের চোখের সামনে ষড়যন্ত্রের পাঁয়তারা শুরু করে তবে কি আমরা অলসভাবে বসে থাকতে পারি?

একটি বৃহৎ শিয়া রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতা ও আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশসহ কতিপয় সুন্নী দেশে বর্তমানে সম্ভাব্য সকল পন্থায় দ্বাদশ ইমামপন্থী শিয়া মযহাবের সমর্থনে এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াতের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে তা যদি ভবিষ্যতে কোনদিন এসব দেশে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার জন্ম দেয় তবে তাতে বিস্ময়ের কিছুই থাকবে না। তাই মুসলিম বিশ্বের সচেতন উলামায়ে কেরাম এ অশুভ তৎপরতাকে প্রতিহত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এবং ক্রমপ্রসারমান শিয়া প্রভাব–বলয়ের কবল থেকে সুন্নী মুসলমানদের রক্ষা করার প্রচেষ্টাকে তাঁরা বর্তমান সময়ে ইসলামের একটি বিরাট খিদমত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এজন্যই ঐতিহাসিক মর্যাদা ও আন্তর্জাতিক পরিচিতির অধিকারী আল্লামা মুহিব্বুদ্দীন আল–খতীব, মওলানা মনজুর নো'মানী এবং আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভীর মতো ইসলামী চিন্তাবিদগণও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ বিষয়ে লেখনী ধারণ করতে এগিয়ে এসেছেন। আমাদের দেশের প্রথম সারির শীর্ষস্থানীয় আলেমগণও যে এক্ষেত্রে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে পিছিয়ে নেই তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে মওলানা উবায়দুল হক, মওলানা মুহিউদ্দীন খান, মওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। এঁদের প্রত্যেকেই আন্তর্জাতিক শিয়াবাদের সুন্নী বিরোধী প্রচারণার বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে কলম যুদ্ধ চালিয়ে আসছেন এবং ধর্মপ্রাণ প্রতিটি মুসলমানকে এক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য এগিয়ে আসতে আহবান জানিয়েছেন।

আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াতের উপরোল্লিখিত নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরামের আহবানই আমাকে এ গ্রন্থটির বংগানুবাদে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আরবী ভাষায় লিখিত আল্লামা মুহিব্বুদ্দীন আল–খতীবের এ গ্রন্থটি বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের নিকট যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও সমাদর লাভ করে তা নজীরবিহীন না হলেও যথেষ্ট গুরুত্ববহ। এতো অল্প সময়ে বিভিন্ন দেশ ও ভাষার পাঠকবর্গের নিকট বইটি এতটা গুরুত্ব ও সমাদর পাওয়ার কারণ হয়তো এই যে,

প্রথমতঃ এটা একটি সুলিখিত গবেষণা কর্ম এবং দ্বিতীয়তঃ এটা অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু বিভ্রান্তির জবাব দিতে সক্ষম হয়েছে যা বিগত দশকগুলোতে আন্তর্জাতিক শিয়াবাদ বিভিন্ন সুন্নী দেশে জন্ম দেয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রকাশিত তাদের প্রায় দেড় ডজন পুস্তকের মধ্যে একটিও যাঁদের পড়ে দেখার সুযোগ হয়েছে তাঁরাই জানেন সত্যকে চাপা দেওয়ার জন্য কিভাবে তারা একটির পর একটি মিথ্যার প্রাসাদ নির্মাণে লিপ্ত রয়েছে, একটি বাতিল ফিরকা হওয়া সত্ত্বেও শিয়াবাদকে ইসলামে পুনর্বাসিত করার জন্য কিভাবে তারা একটির পর একটি প্রতারণার নতুন নতুন ফাঁদ পাততে শুরু করেছে। এ বইটি আমি অনুবাদ করেছি বিশেষভাবে তাঁদেরই জন্য যাঁরা ইতিমধ্যেই ওসব ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারপত্রের মুখোমুখী হয়েছেন অথবা ভবিষ্যতে হবেন। যেন এর বদৌলতে তাঁরা ওগুলোর বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে নিজেদের ঈমান ও আমলকে রক্ষা করতে পারেন।

অনুবাদ সম্পর্কে এতটুকু বলতে চাই যে, বইটির বিষয়বস্তু যথেষ্ট জটিল হওয়া সত্ত্বেও পাঠকবর্গের নিকট সুখপাঠ্য করার জন্য আক্ষরিকতার গন্ডী ছাড়িয়ে আমি বইটি যতটুকু সম্ভব স্বচ্ছন্দে অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি। কোন কোন জায়গায় লেখক যেখানে আভাসে বা অতিসংক্ষেপে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখমাত্র করে আলোচনা এগিয়ে নিয়েছেন সেখানে পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণের জন্য আমি তা একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে দিয়েছি। দুই অংশে বিভক্ত বইটির প্রথম অংশে আলোচিত হয়েছে দ্বাদশ ইমামপন্থী শিয়া মযহাবের আকীদা, মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে দিগ্বিজয়ী বীর নাদির শাহ কর্তৃক আয়োজিত ঐতিহাসিক নজফ সম্মেলনের চমকপ্রদ কাহিনী। এ অংশে আরো রয়েছে একটি মূল্যবান নিবন্ধ যাতে কুরআন, হাদীস ও সলফে সালেহীনের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়েতের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। তিনটি বিষয়ই আলোচনা করা হয়েছে এমনভাবে যে, আপনার পছন্দ বা প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনটি ইচ্ছা আগে বা পরে পড়তে পারেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এ বইটি দ্বারা উপকৃত হবার তওফিক দান করুন।

আবদুশ শাকুর খন্দকার

প্রথম অংশ

দ্বাদশ ইমামপন্থী শিয়া মযহাবের স্বরূপ

শিয়া–সুন্নী ঐক্যঃ একটি শ্লোগান

চিন্তা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভংগি ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও নৈকট্য প্রতিষ্ঠা ইসলামের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। মহৎ প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুসলিম জাতির শক্তি, উত্থান, সমৃদ্ধি ও সংস্কারের চাবিকাঠি। সব দেশে, সর্বকালে মুসলিম জাতি ও জনগণের জন্য এটা অত্যন্ত কল্যাণকর প্রয়াস হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

মুসলমানদের পরস্পর বিবদমান বিভিন্ন দল–উপদলের মধ্যে নৈকট্য ও সমঝোতা স্থাপনের দাওয়াত বা আহবান যদি কোন সংকীর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত না হয় এবং এর ফলে সমাজের উপকৃত হওয়ার চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা বেশী না থাকে, তবে প্রতিটি মুমিন–মুসলমানের কর্তব্য হবে এ দাওয়াতে সাড়া দেয়া এবং এ প্রচেষ্টাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সংগে পূর্ণ সহযোগিতা করা।

ইসলামী সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চার বিভিন্ন কেন্দ্রে বিগত বছরগুলোতে আলোচ্য দাওয়াত সম্পর্কে প্রচুর আলাপ–আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক পর্যায়ে এর প্রসার ও প্রভাব মিসরের বিখ্যাত 'আল–আযহার বিশ্ববিদ্যালয়' পর্যন্ত পৌঁছায়। বলা বাহুল্য, এ বিশ্ববিদ্যালয়টি হলো জনপ্রিয় চারি মযহাবের অনুসারী আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াতের প্রসিদ্ধতম ও বৃহত্তম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। শুধু বর্তমান শতকেই নয় বরং বিগত বহু শতাব্দী যাবৎ 'আল–আযহার' বিশ্বের মুসলিম জনগণ কর্তৃক অনুরূপ মর্যাদার স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। যেকোন ধর্মীয় ব্যাপারে অতীতের মতো বর্তমানেও ইসলামী উম্মাহর নিকট আল–আযহারের মতামত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

আল–আযহার বিশ্ববিদ্যালয় শেষ পর্যন্ত শিয়া–সুন্নী নৈকট্য প্রতিষ্ঠার এ ধারণাটিকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য গ্রহণ করে। শুধু গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং ইতিহাস খ্যাত সালাউদ্দিন আইয়ুবীর যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যে সীমিত পরিসরে এর উপর কাজ চলে এসেছে তার চেয়ে বৃহত্তর পরিসরে বিষয়টি নিয়ে আল–আযহার ব্যাপক গবেষণা শুরু করে। প্রথম বারের মতো আল–আযহার চারি মযহাবের সীমিত গন্ডি থেকে বের হয়ে এসে প্রচলিত অন্যান্য মযহাবের সম্যক পরিচিতি লাভের প্রয়াসে ব্যাপৃত হয়। এ সবের মধ্যে যে মযহাবটির আলোচনা

সর্বাধিক গুরুত্ব পায় সেটি হচ্ছে শিয়া ইমামিয়া ইসনা আশারিয়া তথা দ্বাদশ ইমাম পন্থী শিয়া মযহাব। কিন্তু যথেষ্ট আগ্রহ এবং নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও আল-আযহার এক্ষেত্রে এখনো আপন যাত্রাপথের শুরুতেই রয়ে গেছে। এতেই কি প্রমাণিত হয়না যে বিষয়টি অতীব দুরুহ ও প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ ? তাই আমরা মনে করি গুরুত্বপূর্ণ এ স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা এবং এর বিভিন্ন দিক তথা ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা প্রতিটি সচেতন মুসলমানের একটি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় কর্তব্য। এ কর্তব্যটি সম্পাদনের জন্যই আমরা এ দুরুহ প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হলাম। আংশিকভাবেও যদি এ পুস্তক উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে আপনাদের সহায়তা প্রদানে সক্ষম হয় তবে এক্ষেত্রে আমাদের শ্রম পরিপূর্ণরূপ সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ধর্মীয় সমস্যা ও বিষয়াদি যেহেতু স্বভাবতই জটিল হয়ে থাকে, তাই এগুলোর সমাধান ও পর্যালোচনার পথে অত্যন্ত প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সংগে অগ্রসর হওয়া উচিত। গবেষকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্নিহিত পরিচয়, কার্যকারণসম্বন্ধ ও সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি থাকতে হবে। চিন্তায় ও আচরণে তাঁকে হতে হবে আল্লাহর নূরে উদ্ভাসিত। বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিরপেক্ষ ও ন্যায় পরায়ণ। যাতে করে এ বিচার বিশ্লেষণ ও গবেষণা ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে এবং কল্যাণকর ফলাফল প্রদানে সক্ষম হয়।

আলোচনার শুরুতেই আমরা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে নিতে চাই। তা এইযে, দুই বা ততোধিক পক্ষের সংগে সম্পর্কিত যে কোন সমস্যার সমাধান নির্ভর করে উভয় পক্ষের বা পক্ষসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাবের উপর। আমাদের আলোচ্য সমস্যাটির ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য।

এ যুক্তির সমর্থনে উদাহরণ স্বরূপ আমরা এখানে পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত 'শিয়া-সুন্নী ঐক্য' প্রয়াসের কথা উল্লেখ করতে পারি। শিয়া-সুন্নী নৈকট্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কয়েক দশক পূর্বে মিসরে একটি প্রচার কেন্দ্র খোলা হয়। একটি শিয়া রাষ্ট্রের সরকারী তহবিল থেকে উক্ত প্রচার কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, শিয়া রাষ্ট্রটি তার বদান্যতা ও উদারতা প্রদর্শনের জন্য একটি সুন্নী দেশকে নির্বাচিত করে এবং তাঁর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় বাজেটে মোটা অংক বরাদ্ধ করতে একটুও দ্বিধা করেনা। অথচ দেশটি নিজের ভূমিতে এবং স্বীয় মতাবলম্বীদের জন্য অনুরূপ ঔদার্য প্রদর্শনে কার্পণ্য দেখায়। আরো

মজার ব্যাপার এইযে, তেহরান, কুম, নজফ, জবলে আমিল অথবা শিয়া মযহাবের অন্য কোন প্রচার কেন্দ্রে শিয়া–সুন্নী নৈকট্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোন অফিস খুলতে দাতা দেশটি আজ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

তবে কি তথাকথিত নৈকট্য প্রতিষ্ঠার ধুয়া ধ্বনি–সর্বস্ব একটি শ্লোগান মাত্র? তবে কি এর উদ্দেশ্য সুন্নীদের শিয়াবাদে দীক্ষিত করা? প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মিসরে 'শিয়া–সুন্নী ঐক্য প্রচার কেন্দ্র' শিয়াদের কোন নতুন প্রচেষ্টা নয়। শিয়া মতবাদ প্রচারের জন্য তাদের এ বদান্যতাও নতুন কিছু নয়। অতীতেও বিভিন্ন যুগে তারা বহুবার অনুরূপ বদান্যতা এবং ত্যাগ–তিতিক্ষার প্রমাণ দিয়েছে। শিয়া মতবাদ প্রচারের জন্য বিদেশে যেসব প্রচারক পাঠানো হয় তাদের বদৌলতেই শিয়া সংখ্যালঘিষ্ট সুন্নী দেশ ইরাক সুন্নী সংখ্যালঘিষ্ঠ শিয়া দেশে রূপান্তরিত হয়। আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতীর জীবদ্দশায় ইরান থেকে একজন শিয়া মুবাল্লিগ মিসরে এসে শিয়া মতবাদ প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আল্লামা সূয়ুতী স্বীয় গ্রন্থ 'আল–হাওয়ী লিল ফাতাওয়া'–মুনিরিয়া সংস্করণের প্রথম খন্ডের ৩৩০ পৃষ্ঠায় তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। এই ইরানী শিয়া প্রচারকের প্রভাব থেকে সুন্নীদের রক্ষা করার জন্যই আল্লামা সূয়ুতী তাঁর 'মিফতাহুল জান্নাহ ফিল ই'তিসাম বিসসুন্নাহ 'নামক পুস্তকটি রচনা করেন। (১)

বিগত বছর গুলোতে তেহরান, কুম, নজফ প্রভৃতি শিয়া প্রচার কেন্দ্র থেকে এমন কতিপয় পুস্তক প্রকাশিত হয় যেগুলো শিয়া–সুন্নী সমঝোতা ও নৈকট্য প্রতিষ্ঠার ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করে এবং যেগুলো পাঠ করলে শরীর শিউরে উঠে। তন্মধ্যে 'আয–যাহ্‌রা একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি বড় বড় তিন খন্ডে বিভক্ত এবং নজফের আলিমগণ কর্তৃক প্রকাশিত। শিয়াদের অন্যান্য পুস্তকের মতো এ পুস্তকটিতেও ইসলামের প্রথম তিন খলীফা, উম্মাহাতুল মুমিনীন, আশারায়ে

(১) বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত অনুরূপ কোন প্রচার কেন্দ্র খোলা না হলেও শিয়াবাদের প্রচার–প্রসার এবং শিয়া মযহাবকে সবার নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য এখানে একাধিক প্রতিষ্ঠান সক্রিয় রয়েছে। দক্ষ শিয়া প্রচারক তৈরী করার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বই–পুস্তক রচনা, পত্র–পত্রিকা প্রকাশ, পোষ্টার প্রচারপত্র বিতরণ ইত্যাকার আরো বিভিন্ন পন্থায় বাংলাদেশে শিয়াবাদকে জনপ্রিয় করার কাজ পুরোদমে ও ব্যাপকভাবে এগিয়ে চলেছে। এ প্রসংগে এখানে শিয়া মতবাদের কেন্দ্রস্থল ইরানের কুমে বাংলাদেশী ছাত্রদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি প্রদান, বাংলাদেশী শিক্ষিত যুবকদের শিয়াবাদ শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে ঢাকায় উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং ইমামিয়া মযহাবকে হানাফী মযহাবের অনুরূপ একটি ইসলামী মযহাব হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য বাংলাদেশে ব্যাপক প্রচারণা চালাবার কথাও উল্লেখ করা যায়।

মুবাশ্‌শারা এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহাবায়ে কেরামের উপর এমন সব আজগুবি অভিযোগ, অশোভন উক্তি ও জঘন্য মিথ্যাচার আরোপ করা হয়েছে যেগুলো বিশ্বাস করা তো দূরে থাক পাঠ করলেও নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। এমনকি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর শানে চরম বেয়াদবি পূর্ণ কথাবার্তা বলতেও তাঁদের বাধেনি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ফারুক, হযরত উসমান যুন্নুরাইন এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকাসহ প্রধান প্রধান সাহাবা (রাঃ) কে মিছামিছি গালিগালাজ করা এবং অপবাদ ও অভিশাপ দেওয়া শিয়াদের নিকট অন্যতম পূণ্যের কাজ বলে বিবেচিত। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন আলজিরীয়ার প্রসিদ্ধ আলেম শায়খ বশীর আল-ইব্রাহীমী যিনি তাঁর প্রথমবারের ইরাক সফর কালে এটি পাঠ করার সুযোগ পান।

বলাবাহুল্য, যেসব অপবিত্র অন্তর থেকে এ ধরনের ঘৃণ্য অপরাধ, সুপরিকল্পিত মিথ্যাচার ও অশ্লীল উক্তি প্রকাশিত হতে পারে নৈকট্য ও সমঝোতার দাওয়াতের প্রতি সাড়া প্রদান আমাদের সুন্নীদের অপেক্ষা আসলে তাদেরই প্রয়োজন বেশী। শিয়াদের ও আমাদের মধ্যকার মৌলিক বিরোধ যদি স্থাপিত হয়ে থাকে তাদের এ দাবীর উপর যে, তারা আহলে বাইত অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বংশধরদের প্রতি আমাদের চাইতে অধিক অনুগত এবং তাদের এ দাবীর উপর যে, তারা অন্তরে ও প্রকাশ্যে রসূলুল্লাহর (সঃ) সেইসব সাহাবীর প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ পোষণকারী যাঁদের সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের ফলে সারা বিশ্বে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তবে ইনসাফের দাবী তো এইযে, প্রথমেই তারা সাহাবায়ে কেরাম ও ইসলামের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে তাদের ঈর্ষা-বিদ্বেষের পরিমাণ লাঘব করবে। এরপর আহলে বাইত সম্পর্কে উদার নীতি গ্রহণ করা এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি না করার জন্য তারা সুন্নীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

যে উদ্দেশ্যে এবং যে গরজেই হোক ঐক্য স্থাপনের পদক্ষেপ যখন তারাই প্রথম গ্রহণ করেছে তখন এটাইতো স্বাভাবিক যে, এক্ষেত্রে যতটুকু দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায় ততটুকু যথাযথভাবে পালন করার পরই কেবল তারা আমাদের আহবান জানাতে পারে আমরা যেন সঠিকভাবে আমাদের কর্তব্য প্রতিপালন করি। আমাদের করণীয় কি এর চেয়ে বেশী কিছু হতে পারে যে, আমরা তাদের ইমামগণের প্রতি শ্রদ্ধা পোষন করব? আমরা তো আগে থেকেই তা করে আসছি, আমরা তো এমন কোন বিশ্বাস পোষণ করিনা যা তাঁদের অন্তরে আঘাত দিতে পারে। হ্যাঁ, আহলে বাইতের প্রতি আমাদের ত্রুটি বেশীর চেয়ে বেশী এতটুকু হতে পারে যে, আমরা

তাঁদের ইলাহ বা উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করিনি, যেমনটি দেখা যায় আমাদের প্রতিপক্ষের আকীদা-বিশ্বাস ও আচার-আচরণে।

যে দু'পক্ষের মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হয়, সে পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকেরই একের প্রতি অপরের সমভাবে আকর্ষণ,আন্তরিকতা ও সহানুভূতি থাকা অপরিহার্য। প্রত্যাশিত এ মিলন তখনই আশা করা যেতে পারে যখন ধনাত্মক দিকের সাথে ঋণাত্মক দিকের সংযোগ ঘটে এবং ঐক্যের প্রতি আহবানের যাবতীয় তৎপরতা ও তা বাস্তবায়নের কার্যক্রম বিশেষ কোন এক পক্ষের উপরই সীমাবদ্ধ না থাকে, যেমনটি বর্তমানে দৃষ্ট হয়। শিয়া মতাবলম্বীদের এ আশা যে, তারা তাদের ভ্রান্ত ও বিদ্বেষপূর্ণ বিশ্বাসে অটল থাকবে আর সুন্নীরা তাদের সঠিক ও নির্দোষ বিশ্বাস থেকে সরে এসে শিয়াদের সন্তুষ্ট করার জন্য পক্ষপাতদুষ্ট নৈকট্য প্রতিষ্ঠার আহবানে সাড়া দেবে, কখনো ইনসাফ ভিত্তিক হতে পারেনা।

শিয়া মযহাবের রাজধানী এবং শিয়াবাদ প্রচার ও অ-শিয়াদের উপর আক্রমণ পরিচালনার সক্রিয় এ কেন্দ্রসমূহ বাদ দিয়ে কেবল আহলে সুন্নাহর রাজধানী 'মিসরের' স্থাপিত একটি কেন্দ্র থেকে নৈকট্য প্রতিষ্ঠার একতরফা আহবান জানানো যেমন অসমীচীন, তেমনি শিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বাদ দিয়ে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে শিয়া-সুন্নী ঐক্যের অন্তর্ভূক্তির দাবীও অযৌক্তিক। প্রকৃত অবস্থা এইযে, যে সকল সমস্যা দুই বা ততোধিক পক্ষের সংগে সম্পৃক্ত সেগুলোর সমাধানের দায়-দায়িত্ব যদি শুধু বিশেষ কোন একটি পক্ষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তবে সে চেষ্টা কখনো সাফল্য লাভ করতে পারেনা।

বস্তুতঃ মৌলিক বিষয়ের আগে অথবা মৌলিক বিষয়কে এড়িয়ে শাখা-প্রশাখা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে অযথা সময় নষ্ট করা কোন দ্বি-পাক্ষিক সমস্যার সমাধান বের করার কার্যকরী কোন পদ্ধতি নয়। ইসলামী ফিকহ বা ব্যবহার শাস্ত্র আহলে সুন্নাহ ও শিয়াদের নিকট, উভয় পক্ষের সর্বসম্মত কোন মৌলিক নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আহলে সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত চার ইমামের নিকট ফিকহী বিধান প্রণয়নের ভিত্তি যে সব মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত শিয়াদের নিকট ইসলামী ব্যবহারিক আইন প্রণয়নের ভিত্তি সেসব মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যতক্ষন পর্যন্ত পরস্পর বিরোধী এসব মূলনীতির উপর সমন্বয় সাধিত না হবে এবং উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠন সমূহে যতক্ষণ এসব বিষয়ে একটি সংশোধিত ও সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচী অনুসৃত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মৌলিক বিষয়সমূহ বাদ দিয়ে কেবল শাখা-প্রশাখা বা আনুসংগিক বিষয় নিয়ে সময় অপচয় করায় কোন লাভ নেই।

তাকিইয়া নীতি

আমাদের ও শিয়াদের মধ্যে সত্যিকার ঐক্য ও সমঝোতা স্থাপনের পথে সর্বপ্রথম বাধা হলো তাদের 'কিতমান' ও 'তাকিইয়া' নীতি। কিতমান শব্দের অর্থ হচ্ছে গোপন রাখা, অন্যের কাছে প্রকাশ না করা। তাকিইয়া অর্থ হল কথায় ও ব্যবহারে প্রকৃত অবস্থার বিপরীত ভাব প্রদর্শন এবং আপন বিশ্বাস ও মতের বিপরীত মত প্রকাশ করা, আর এভাবে অপরকে প্রতারিত করা। কিতমান ও তাকিইয়া শিয়া মযহাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং তাদের বিশ্বাসের অপরিহার্য অংশ। আমাদের জানা মতে বিশ্বের অন্য কোন ধর্ম ও মযহাবের অনুসারীরা অনুরূপ ভ্রান্ত, কাপুরুষোচিত ও প্রতারণামূলক বিশ্বাস পোষণ করেনা। ছোটবড় যেকোন সমস্যার মুকাবিলা এবং যেকোন প্রতিকূল পরিবেশে আত্মরক্ষার জন্য শিয়ারা 'কিতমান ও তাকিইয়া'র আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। তাদের মতে তাদের ইমামগণও পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সারাজীবন এ নীতি অনুসরণ করে চলেছেন।

এটা সর্বজনবিদিত সত্য যে, বিশ্বের প্রাচীন ও আধুনিক প্রত্যেক ধর্ম এবং মতবাদই তবলীগ বা প্রচারের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। প্রত্যেক ধর্ম এবং মতবাদের অনুসারীরাই তাদের আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রম, সম্পদ, এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে গর্ব বোধ করে। একমাত্র শিয়ারাই এর ব্যতিক্রম। প্রচারই যেখানে যেকোন আদর্শের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার সর্বোত্তম মাধ্যম, সেখানে দ্বাদশ ইমামপন্থী শিয়াদের কেন এ প্রচার বিমুখতা? কেন তারা তাদের বিশ্বাসকে গোপন রাখতে এতটা তৎপর? তবে কি তারা তাদের ধর্ম বিশ্বাসকে ভ্রান্ত মনে করে? কোনও একটি বিশ্বাসকে গোপন রাখার সযত্ন প্রয়াস এবং গোপন রাখতে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ও বিপরীত আচরণকে বৈধ মনে করাই সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

দ্বাদশ ইমামপন্থী শিয়া মযহাবের অনুসারীরা তাদের প্রথম ও প্রধান মৌল বিশ্বাস ইমামতের বিষয়টিকে তওহীদ ও রিসালতের মতোই ধর্মের ভিত্তি এবং নাজাতের শর্ত মনে করা সত্ত্বেও এটি গোপন নীতি হয়তো এজন্যই গ্রহণ করেছে যে, তারা এটাকে যুক্তিনির্ভর ও গ্রহণযোগ্য কোন বিশ্বাস বলে মনে করেনা। ইতিহাস একথা প্রমাণ করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ যে, সাইয়েদেনা হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) থেকে শুরু করে শিয়াদের একাদশ ইমাম হযরত হাসান

আসকারী পর্যন্ত কেউ কোনদিন প্রকাশ্যে ও জনসমক্ষে ইমামতের দাবী ঘোষণা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইমামতের বিশ্বাস ও তাকিইয়া নীতি উভয়টিই পরবর্তী কালের উদ্ভাবন এবং একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। কিতমান ও তাকিইয়া ছাড়া যেমন ইমামতের কাল্পনিক সৌধকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়না তেমনি ইমামতকে বাদ দিলে তাকিইয়ার কোন প্রয়োজনই থাকেনা।

ইসলামে ভিত্তিহীন ও কুরআন-হাদীসে অনুপস্থিত শিয়াদের ইমামত আকীদা এবং ততোধিক ভিত্তিহীন, কল্পনা প্রসূত ও অমর্যাদাপূর্ণ তাকিইয়া নীতি যেহেতু পরস্পর নির্ভরশীল, তাই তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহে ইমামতের মতো তাকিইয়ার উপরও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। শিয়াদের বুখারী বলে খ্যাত আল্লামা কুলাইনীর 'আল-জামীউল-কাফী' গ্রন্থে কিতমান ও তাকিইয়া সম্পর্কে আলাদা আলাদা অধ্যায় রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়েই রয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ইমামদের বাণী এবং এসব বাণীর ব্যাখ্যা ও সমর্থনে বহুসংখ্যাক উদাহরণ। কিতমান অধ্যায়ে ইমাম জাফর সাদেকের জনৈক বিশিষ্ট শিষ্য ও সাথী সুলায়মান ইবনে খালিদ কর্তৃক বলানো হয়েছে যে, তিনি বলেনঃ قال أبوعبد الله عليه السلام ياسليمان إنكم على دين من كتمه اعزه الله ومن أذاعه أذله الله -

ইমাম জাফর সাদেক বলেন, হে সুলায়মান, তোমরা এমন এক ধর্মের অনুসারী যার গোপনকারীকে আল্লাহ তায়ালা সম্মান দান করবেন এবং প্রকাশকারীকে আল্লাহ অপমানিত করবেন। অন্য এক স্থানে ইমাম জাফর সাদেকের পিতা বাকেরের নিম্নলিখিত উক্তিটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি তাঁর বিশিষ্ট শিষ্যদের লক্ষ্য করে বলেনঃ

ان أحب أصحابى إلىّ اورعهم وافقههم واكتمهم لحديثنا

আমার সহচরদের মধ্যে আমার নিকট সেই ব্যক্তি সর্বাধিক প্রিয় যে সর্বাধিক পরহেযগার, সর্বাধিক সমঝদার এবং আমাদের কথাবার্তা সর্বাধিক গোপনকারী।[১]

তাকিইয়া অধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য রিওয়ায়েত এইঃ

عن عمير الأعجمى قال قال لى أبوعبد الله عليه السلام يا أبا عمير تسعة أعشار الدين فى التقية ولادين لمن لا تقية له -

(১) উক্ত রিওয়ায়েত দুটো 'আল-জামীউল-কাফী' লক্ষ্ণৌ সংস্করণের যথাক্রমে ৪৮৫ ও ৪৮৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

আবু উমাইর আ'জমী বর্ণনা করেন যে, আবু আবদুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম (ইমাম জাফর সাদেক) আমাকে বলেছেনঃ ধর্মের দশ ভাগের নয় ভাগ তাকিইয়ার মধ্যে নিহিত। যে তাকিইয়া করেনা সে ধর্মহীন। (আল-জামীউল-কাফী ৩৮২পৃঃ) অন্য একটি রিওয়ায়েত এরূপঃ

قال أبو جعفر عليه السّلام التقية من دينى ودين أبائى ولا إيمان لمن لا تقية له ـ

আবু জাফর আলাইহিস্সালাম (ইমাম বাকের) বলেনঃ তাকিইয়া আমার ধর্ম এবং আমার পিতৃপুরুষের ধর্ম। যে তাকিইয়া করেনা তার ঈমান নেই। (আল-জামীউল-কাফী ৩৮৪ পৃঃ)। তাকিইয়া শিয়াদের চারটি মূলনীতির অন্যতম এবং এর গুরুত্ব তাদের নিকট নামাযের সমান।

শিয়াদের من لا يحضره الفقيه গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছেঃ

قال الصادق عليه السلام لوقلت ان تارك التقية كتارك الصّلاة لكنت صادقا وقال عليه السلام لا دين لمن لا تقية له ـ

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বলেছেনঃ আমি যদি বলি যে, তাকিইয়া বর্জনকারী নামায পরিত্যাগকারীর অনুরূপ তবে তা সত্যই বলা হবে। তিনি আরো বলেন, যার তাকিইয়া নেই তার ধর্ম নেই।

তাছাড়া আল জামী উল কাফীর তাকিইয়া অধ্যায়ে বিদ্যমান নিম্নলিখিত রিওয়ায়েতটি থেকে জানা যায় যে, ছোট বড় যেকোন প্রয়োজনে তাকিইয়ার সুযোগ গ্রহণ করা যায়ঃ

عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال التقية فى كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به ـ

যুরারা থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু জাফর অর্থাৎ ইমাম বাকের (আঃ) বলেনঃ তাকিইয়া যে কোন প্রয়োজনে করা যায়। প্রয়োজন কোনটি তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই নির্ধারণ করবে। এ রিওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন পরিস্থিতিতে তাকিইয়ার আশ্রয় নিতে পারবে। আল-জামীউল-কাফী সহ নির্ভরযোগ্য শিয়া গ্রন্থসমূহে তাদের ইমামদের জীবনের এমন প্রচুর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যেগুলোতে দেখা যায় যে, বিশেষ কোন প্রয়োজন, আশংকা এবং বাধ্যবাধকতা ছাড়াই তাঁরা

নির্দ্বিধায় তাকিইয়া করেছেন, সুস্পষ্ট মিথ্যা বলেছেন অথবা আপন অসত্য ও কৃত্রিম কাজ দ্বারা মানুষকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করেছেন।

অথচ এমনটি হবার কথা নয়। তাকিইয়া যদি বৈধ হয় তবে তা হবে গুরুতর কোন কারণে, বাধ্যবাধকতায় ও জান-মালের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি দেখা দিলে। তাও কেবলমাত্র সাধারণ শ্রেণীর দুর্বল ঈমানওয়ালা লোকদের জন্য। এ ধরনের বিপজ্জনক অবস্থায় পতিত হলে দুর্বলেরা রুখসতের উপর আমল করতে পারে, একটি অনুমোদিত বিষয় হিসাবে কিতমান ও তাকিইয়ার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আদর্শস্থানীয় ইমাম, মুজতাহিদ, মুবাল্লিগ তথা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের জন্য তাকিইয়া নয়। তাঁরা প্রদর্শন করবেন আযীমত, সহনশীলতা, দৃঢ়চিত্ততা, বিপদে ধৈর্য ধারণ করার দৃষ্টান্ত। আল্লাহর পথে, ইসলামের জন্য, আপন আদর্শ ও বিশ্বাসকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য তাঁরা আত্মত্যাগ করবেন, কষ্ট সহ্য করবেন এবং হাসিমুখে যে কোন চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করবেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা করেছেনও তাই। রসূলুল্লাহ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের জীবনে এ ধরনের শত-সহস্র ঘটনার প্রমাণ রয়েছে। আল-কুরআনের অনেক স্থানে এর স্বীকৃতি বিদ্যমান। নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবসমূহ এসব বীরত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনায় ভরপুর। রসূলুল্লাহর অকুতোভয় মহান সাহাবীগণ দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করতেন, বিপদ এড়ানোর জন্য ঈমানের দাবী পরিত্যাগ বা সত্য গোপন করতেন, এমন কোন প্রমাণ ইসলামের ইতিহাসে নেই।

তাই একথা কল্পনাও করা যায় না যে, হযরত আলী মুর্তযা, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, সালমান ফারসী (রাঃ)-এর মতো বিশিষ্ট ও মর্যাদাবান সাহাবী মুনাফিক বা কাপুরুষ হতে পারেন এবং তাকিইয়া নীতি অবলম্বন করতে পারেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, "তাকিইয়া হচ্ছে রাফেযীদের বৈশিষ্ট্য--যাদের চরিত্র হচ্ছে কাপুরুষতা, গুণ হচ্ছে কপটতা, পুঁজি হচ্ছে মিথ্যা এবং যাদের শপথ হচ্ছে ধোকা দেবার অস্ত্র। তারা ইমাম জাফর সাদেকের উপর মিথ্যা আরোপ করেছে যে তিনি বলেছেন, 'তাকিইয়া হল আমার ও আমার পিতৃপুরুষদের ধর্ম'। আল্লাহ তায়ালা আহলে বাইতকে এ ধরনের নীচতা থেকে রক্ষা করেছেন। তাঁরা ছিলেন ঈমানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আন্তরিক ও শক্তিশালী। তাঁদের ধর্ম তাকওয়া, তাকিইয়া নয়।"

দ্বাদশ ইমামপন্থী শিয়ারা বিশ্বাস করে যে, হযরত আলী এবং তাঁর চারজন সঙ্গী সালমান ফারসী, আবুযর গিফারী, মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ও আম্মার ইবনে ইয়াসির প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীককে মুনাফিক (নাউযুবিল্লাহ) জেনেও

চাপের মুখে বাধ্য হয়ে তাঁর হাতে বাইয়াত করেছিলেন। শিয়াদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ইহতিজাজে তবরিযীতে উল্লেখ রয়েছেঃ

مامن الأمة أحد بايع مكرها غير على وأربعتنا -

যার অর্থ হচ্ছে 'আলী ও আমাদের চারজন ছাড়া উম্মতের কেউ আবু বকরের হাতে বাধ্য হয়ে বাইয়াত করেনি।' শিয়া মযহাবের একটি মৌলিক বিশ্বাস এই যে, হযরত আলী অতঃপর ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর এবং তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমানের হাতেও তাকিইয়া করা বা ধোকা দেবার উদ্দেশ্যেই বাইয়াত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রথম তিন খলীফার ২৪ বছরের শাসনামলে এই তাকিইয়া তথা মিথ্যার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। অন্তরে তাঁদের খিলাফতে আদৌ বিশ্বাসী না হলেও এবং তাঁদেরকে মুনাফিক, মুরতাদ, জবরদখলকারী মনে করলেও বাহ্যতঃ তাদের আনুগত্য করে গেছেন। আপন বিশ্বাস ও ভিন্নমতের প্রকাশ ঘটিয়ে নিজের জন্য বিপদ ডেকে আনেননি। (নাউযুবিল্লাহ!)

ন্যূনতম ঈমানের অধিকারী কোন মুসলমানও কি ইসলামের চতুর্থ খলীফা কুরাইশ তরুণদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হযরত আলী মুর্তযা সম্পর্কে এ ধরনের হীন ধারণা পোষণ করতে পারে? এ-ও কি সম্ভব যে, নবী কর্তৃক আল্লাহর শার্দুল খেতাব প্রাপ্ত, অসাধারণ দৈহিক বলের অধিকারী, সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গকারী, মহাজ্ঞানী, অসমসাহসী বীর হযরত আলী তাকিইয়ার মতো জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন পার্থিব লালসা চরিতার্থ করার জন্য? প্রকৃতপক্ষে তাকিইয়ার অপবাদ দিয়ে শিয়ারা রসূলুল্লাহর জামাতা, আরবদের গর্ব, মুসলমানদের অহংকার, পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হযরত আলী মুর্তযাকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে, তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্রকে কলংকিত করেছে।

কুরআন শরীফে বিকৃতির অভিযোগ

যে কুরআন শরীফ আমাদের ও তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ এবং উভয়পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য সাধারণ সূত্র হবার দাবী রাখে, সে কুরআন শরীফও তাদের মিথ্যা অপবাদ থেকে রেহাই পায়নি। ইমামিয়া শিয়াদের এটা একটি সুস্পষ্ট বিশ্বাস যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর ইন্তেকালের পর কুরআন মজীদ তার পূর্বের অবস্থায় বিদ্যমান নেই। ইসলামের প্রথম তিন খলীফা হযরত আবুবকর, ওমর ফারুক ও ওসমান গনীর শাসনামলে আল–কুরআনে প্রচুর কাটছাঁট, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। অবশ্য এ ধরনের বিশ্বাস শিয়া মযহাবের সাথে সংগতিপূর্ণ। কারণ, শিয়া মযহাবের মূলনীতি সমূহের ভিত্তিই প্রতিষ্ঠিত আল–কুরআনের অপব্যাখ্যা এবং আয়াতসমূহের অর্থের বিকৃতির উপর। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বাণীও কর্মের দ্বারা আল–কুরআনকে যেভাবে উম্মতের জন্য রেখে গেছেন আর সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে এর আয়াতসমূহের মর্ম অনুধাবন করেছেন, শিয়া ইমাম ও আলেমগণ সেভাবে বুঝেননি এবং ব্যাখ্যাও করেননি। আল–কুরআনকে তাঁরা বুঝেছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন সেভাবেই, যেভাবে বুঝলে ও ব্যাখ্যা করলে তাঁদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাঁদের মৌলিক বিশ্বাস ইমামতের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। অথচ আল–কুরআনে আদৌ ইমামতের উল্লেখ মাত্র নেই।

শিয়াদের প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থসমূহে তাঁদের ইমামদের অসংখ্য উক্তি উদ্ধৃত করে আল–কুরআনের বিকৃতির দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তন্মধ্যে তাদের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ আল–জামিউল–কাফীতেই রয়েছে সূত্র ও উদাহরণসহ কয়েক ডজন রিওয়ায়েত। এটা শিয়া মযহাবের একটি জনপ্রিয় ও সাধারণ বিশ্বাস যে, সেটিই আসল কুরআন যেটি তাদের প্রথম ইমাম হযরত আলী (রাঃ) সংকলন করেছিলেন। এখনো সেটি অন্তর্হিত ও প্রতীক্ষিত ইমামদের কাছে বিদ্যমান রয়েছে এবং তা বর্তমান কুরআন থেকে ভিন্নতর। শিয়াদের বিশ্বাস যে, সমগ্র কুরআন তাদের ইমামগণ ব্যতীত অন্য কেউ সংকলন করেনি এবং সম্পূর্ণ কুরআন ইমামগণ ছাড়া কারো কাছে কখনো ছিল না, এখনো নেই। শিয়াদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি জনপ্রিয় বিশ্বাস এই যে, বর্তমান কুরআন প্রকৃত কুরআনের অর্থাৎ মসহাফে ফাতেমীর এক–তৃতীয়াংশ মাত্র। এখানে এ প্রসঙ্গে আল–জামিউল–কাফীর একটি রিওয়ায়েত উল্লেখ করা যেতে পারে।

ثم قال وان عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام ومايدريهم ما مصحف فاطمة قال فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد ـ

"অতঃপর ইমাম জাফর সাদেক বললেনঃ আমাদের নিকট মসহাফে ফাতেমী রয়েছে। তারা কি জানে মসহাফে ফাতেমী কী? তিনি বললেনঃ সেটি তোমাদের এই কুরআনের তিনগুণ। আল্লাহর কসম, এতে তোমাদের কুরআনের একটি হরফও নেই।"

শিয়াদের সাধারণ ধর্মগ্রন্থসমূহে আল–কুরআনে বিকৃতি প্রমাণের জন্য পৃথক অধ্যায় এবং প্রচুর তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত বিস্তারিত আলোচনা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের উলামায়ে কেরামএতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই পরবর্তীকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিয়া আলেম, মুহাদ্দিস, মুজাদ্দিদ হিসেবে স্বীকৃত, আল্লামা মির্যা হুসাইন বিন মুহাম্মদ তকী নূরী তবরিযী ১৩৯২ হিজরীতে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থটি রচনা করেন হযরত আলীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পবিত্র নজফে আশরাফ শহরের মাশহাদে আমীরুল মুমিনীন নামক স্থানে বসে এবং এর নাম রাখেন

فصل الخطاب فى اثبات تحريف كتاب رب الارباب ـ

(মহান প্রভুর গ্রন্থে বিকৃতি প্রমাণে চূড়ান্ত কথা)। এ কিতাব রচনার বদৌলতে তিনি শিয়াদের নিকট মর্যাদার এমন উচ্চ স্তরে আরোহণ করেন যে, ১৩২০ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হলে তারা তাঁকে নজফে অবস্থিত মাশহাদে মুরতাযী ভবনে সুলতান নাসের লি–দীনিল্লাহ তনয়া মহীয়সী বানুর প্রাসাদ সন্নিহিত সুবৃহৎ কক্ষে দাফন করে। এ স্থানটি তাদের পবিত্র ভূমি নজফে আশরাফের কিবলামুখী দরজা দিয়ে মুরতযা প্রাঙ্গণে প্রবেশ পথের ডান পার্শ্বে অবস্থিত।

লেখক এ গ্রন্থে বিভিন্ন যুগের শিয়া আলেম ও গবেষকদের শত–সহস্র উদ্ধৃতি এবং ইমামগণের উক্তির উল্লেখ করে একথা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, বর্তমান কুরআনে অনেক কাটছাঁট ও পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনকারীরা, প্রথম তিন খলীফা ও তাঁদের সাথীরা, এ থেকে অনেক অংশ বাদ দিয়েছেন এবং এতে নিজেদের পক্ষ থেকে অনেক কিছু সংযোজনও করেছেন। তবরিযীর এ গ্রন্থ সর্বপ্রথম যখন ইরানে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় তখন শিয়াদের মধ্যে এ নিয়ে তুমুল হৈচৈ শুরু হয়। শিয়ারা চেয়েছিল যে, আল–কুরআনের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সংশয়–সন্দেহ তাদের বিশিষ্ট লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক এবং তাদের নির্ভরযোগ্য শত শত গ্রন্থের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকুক। তারা মোটেই চায়নি যে, এসব গোপন তথ্য এক জায়গায় একটিমাত্র কিতাবে সন্নিবেশিত করে এর হাজার হাজার কপি ছাপিয়ে বাজারে ছাড়া হোক এবং তাদের বিরোধী পক্ষ এ সম্পর্কে অবহিত হয়ে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রকাশ করুক। শিয়া বুদ্ধিজীবি মহলে যখন অনুরূপ মনোভাব

রীতিমত অসন্তোষে রূপান্তরিত হল এবং প্রকাশ্যেই তাঁরা এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন, তখন গ্রন্থকার তাঁদের আপত্তি অপনোদন ও স্বীয় মতের সঠিকতা প্রমাণের জন্য আরেকটি পুস্তক রচনা করেন। এর নাম দিলেনঃ

"رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب"۔

('মহান প্রভুর কিতাবে বিকৃতি প্রমাণে চূড়ান্ত কথা'– সম্পর্কে কতিপয় অভিযোগের জবাব)। তিনি তাঁর জীবনের শেষ ভাগে মৃত্যুর মাত্র দু'বছর পূর্বে এ পুস্তকটি লিখে যান।

এ পুস্তকে আল্লামা তবরিযী সুস্পষ্টভাবে এ–কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, "কুরআন শরীফে বিকৃতির আকীদা শিয়া মযহাবের মৌলিক বিশ্বাসসমূহের অন্তর্ভূক্ত। এর উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে ইমামিয়া শিয়া মযহাবের গোটা সৌধ। তাছাড়া এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী শিয়া আলেম ও ইমামগণের শত শত নয় হাজার হাজার সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন উক্তি রয়েছে। মৌলিক শিয়া ধর্মগ্রন্থসমূহ এসব উক্তি ও যুক্তিতে ভরপুর। কাজেই এক্ষেত্রে সুন্নীদের অনুরূপ বিশ্বাস পোষণ এবং বর্তমান কুরআনকে সঠিক ও অবিকৃত বলে মেনে নেয়া কেবলমাত্র শিয়া উলামা ও ইমামদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই নয় বরং প্রকারান্তরে শিয়া মযহাবের বিশুদ্ধতাকে অস্বীকার করার শামিল।" কুরআনকে বিকৃত প্রমাণ করার ক্ষেত্রে তবরিযী যে কঠোর পরিশ্রম ও মৌলিক গবেষণা করেছেন সেজন্য তিনি শিয়াদের হৃদয়ে এক বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। শিয়া ধর্মের জন্য তাঁর মহান খিদমতের পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে নজফের 'মাশহাদে আলাভী' নামক সৌধের সেই বিশেষ সম্মানিত স্থানে দাফন করে–যা তাদের মতে পৃথিবীর পবিত্রতম স্থান।

কুরআন শরীফে কাটছাঁট সংঘটিত হবার ব্যাপারে এই নজফী আলেম যেসব যুক্তি–প্রমাণ পেশ করেন তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাঁর উপরোক্ত কিতাবের ১৮০ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান একটি সূরা, শিয়ারা যার নাম দিয়েছে 'সূরাতুল বিলায়াত'। তাদের মতে এ সূরাটি মূল কুরআনের অন্তর্ভূক্ত ছিল যা পরে বাদ দেয়া হয়েছে। এ সূরার মধ্যেই উল্লেখিত হয়েছিল হযরত আলীর বেলায়েত প্রাপ্তির কথা। সূরাটি আরম্ভ হয়েছে এভাবেঃ

یاایّها الذین آمنوا آمنوا بالنّبیّ والولی الذین بعثناهما یهدیانکم الی صراط مستقیم ۔۔۔

(হে ঈমানদার লোকগণ, তোমরা নবী ও ওলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, যাদের উভয়কেই আমরা প্রেরণ করেছি তোমাদের সরল–সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য। ......)

(সূরাতুল বিলায়াতের ফটো কপি অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

« سورة الولاية » منقولة فطوغرافيا عن أحد مصاحف ايران

وعلى كل جملة منها ترجمتها بالفارسية

'সূরাতুল বিলায়াত'—ইরানের একটি যাদুঘর থেকে ছবিটি নেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের নীচে ফারসী তরজমা।

অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সউদী পন্ডিত শায়খ মুহাম্মদ আলী, যিনি এক সময় মিসরের বিচারমন্ত্রণালয়ে সিনিয়র বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন এবং শায়খ মুহাম্মদ আবদুহুর অন্যতম শিষ্য ছিলেন, প্রাচ্য ভাষা বিশারদ মিঃ ব্রাইনের নিকট সংরক্ষিত মসহাফে ইরানীর একখানা পান্ডুলিপি দেখতে পেয়ে তা-থেকে তিনি এ সূরাটির ফটোগ্রাফি করে নেন। সূরাটিতে আরবী লাইনের নীচ দিয়ে ইরানী ভাষায় এর অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আল্লামা তবরিযী স্বীয় গ্রন্থ

فصل الخطاب فى اثبات تحريف كتاب رب الارباب -

এর মধ্যে যেমন উক্ত সূরাটি সন্নিবেশিত করেছেন তেমনি আরেকজন শিয়া লেখক আল্লামা মুহসিন ফানী আল-কাশমিরী কর্তৃক ফারসী ভাষায় প্রণীত دبستان مذاهب - (দবিস্তানে মাযাহিব) নামক গ্রন্থেও এর উল্লেখ রয়েছে। শেষোক্ত গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ ইরানে মুদ্রিত হয়েছে এবং তা থেকেই প্রাচ্যবিদ 'নলদাক' আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপকারী এই সূরাটি তাঁর "History of Scriptures" নামক গ্রন্থে ২য় খন্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেন। পরে ১৮৪২ সনে ফ্রাংকো-এশীয় জার্নালের ৪৩১-৪৩৯ পৃষ্ঠায় মন্তব্যসহ এটা প্রকাশিত হয়।

কুরআন শরীফে বিকৃতি প্রমাণের জন্য এই নজফী আলেম তার গ্রন্থে যেমন সূরাতুল বিলায়েতের উল্লেখ করেছেন, তেমনি শিয়াদের বুখারী নামে খ্যাত 'আল-জামিউল-কাফী'র ২৮৯ পৃষ্ঠায় (ইরানী সংস্করণ, ১২৭৮ খৃঃ) উল্লেখিত একটি অংশের উদ্ধৃতির মাধ্যমেও তিনি একথা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, 'আল-কুরআন বিকৃত'। উদ্ধৃত অংশটিতে আল-কাফীর গ্রন্থকার বলেন, "আমাদের একাধিক বিশ্বস্ত সাথী সহল বিন যিয়াদ থেকে, তিনি মুহাম্মদ বিন সুলায়মান থেকে, তিনি তাঁর একজন সাথী থেকে, তিনি আবুল হাসান আলাইহিসসালাম (দ্বিতীয় আবুল হাসান আলী বিন মূসা রেজা-মৃত্যু, ২০৬ হিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গীকৃত, আমরা কুরআন শরীফে এমন কিছু সংখ্যক আয়াত দেখতে পাই যা আমাদের নিকট সংরক্ষিত আয়াত থেকে ভিন্ন এবং যেগুলো খুব ভাল করে পড়তেও পারিনা। এগুলো পড়লে কি আমরা গুনাহগার হবো? তখন তিনি উত্তর দিলেন, "না, তোমরা যেভাবে শিখেছ সেভাবেই পড়। শীঘ্রই তোমাদের নিকট এমন একজন আসবেন যিনি তোমাদের প্রকৃত শিক্ষা দিবেন।"

নিঃসন্দেহে এটা এমন একটি উক্তি যা শিয়ারা মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং তাদের ইমাম আলী বিন মূসা রেজার নামে চালিয়ে দিয়েছে। এ মনগড়া রেওয়ায়েতের পেছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই ফতওয়ার সমর্থনে দলিল পেশ করা যাতে বলা হয়েছে যে, মসহাফে উসমানী অনুসারে কেউ কুরআন তেলাওয়াত করলে সে গুনাহগার হবে না। একথা বুঝতে কারো কষ্ট হবার কথা নয় যে, ফতওয়াটির উদ্দেশ্য শিয়াদের এ সান্ত্বনা দেওয়া যে, মসহাফে উসমানী বা বর্তমান কুরআন পাঠ করাটা কাম্য না হলেও কেউ যদি অবস্থার চাপে-পড়ে তা পড়তে বাধ্য হয় তবে তার পাপ হবে না। কারণ, এটি কোন স্থায়ী ব্যবস্থা নয়, শীঘ্রই তাদের প্রতীক্ষিত ইমাম পুনরাবির্ভূত হয়ে মসহাফে ফাতেমী বা কোরআন শিক্ষা দিবেন।

শিয়াদের নিকট সংরক্ষিত কল্পিত কুরআন তথা মসহাফে ফাতেমী এবং বর্তমানে প্রচলিত আমাদের কুরআন তথা মসহাফে উসমানীর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার জন্যই আল্লামা তরবিযী তাঁর فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب নামক কিতাবখানা প্রণয়ন করেন। শিয়ারা বাহ্যতঃ তাকিইয়া নীতি অনুসারে তবরিযীর গ্রন্থের সাথে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করলেও এ গ্রন্থে বিদ্যমান নির্ভরযোগ্য শিয়া ইমামগণের শত সহস্র উদ্ধৃতি ও উক্তিই একথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে, তারা কুরআনের বিকৃতি সম্পর্কে অটল বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। তবে তারা পছন্দ করে না যে, কুরআন শরীফ সম্পর্কে তাদের এ আকীদা অন্যরা জেনে ফেলুক এবং এ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উত্থিত হোক। এরপরও কথা থেকে যায়। তাদের বিশ্বাস যে, কুরআন প্রকৃতপক্ষে দু'টি। একটি সর্বজনবিদিত প্রচলিত কুরআন, অপরটি বিশিষ্ট ও প্রচ্ছন্ন কুরআন। শেষোক্তটির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সূরাতুল বিলায়াত। এ বিশ্বাসের আলোকেই শিয়ারা সেই কথার উপর আমল করে চলেছে যা তাদের আলেমরা ইমাম আলী বিন মূসা রেজার নামে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছিল। "তোমরা যেভাবে শিখেছ সেভাবেই পড়, শীঘ্রই এমন একজন আসবেন যিনি তোমাদের প্রকৃত শিক্ষা দিবেন।" শিয়াদের আরেকটি ভ্রান্ত ধারণা এই যে, وجعلنا عليا صهرك (এবং আলীকে তোমার জামাতা করে দিলাম) আয়াতটি বাদ দেওয়া হয়েছে। তারা বিশ্বাস করে, এ আয়াতটি সূরা الم نشرح থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এটা সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তারা অনুরূপ বিশ্বাস পোষণ করতে লজ্জাবোধ করে না। তারা জানে যে সূরা 'আলাম নাশরাহ' মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং মক্কা থাকাকালীন হযরত আলী রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জামাতা হননি। তখন তাঁর একমাত্র জামাতা ছিলেন উমাইয়া

বংশের আ'স বিন রবী'। হযরত ফাতিমার সঙ্গে হযরত আলীর বিয়ে সম্পন্ন হয় মদীনায় হিজরতের পর। তাছাড়া হযরত আলী যেখানে বিয়ে করেছিলেন রসূল (সঃ)-এর একজনমাত্র কন্যাকে সেখানে হযরত উসমান করেছিলেন পর পর দুজন কন্যাকে। যখন দ্বিতীয় কন্যার মৃত্যু হল তখন রসূল (সঃ) হযরত উসমানকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها- "আমার যদি তৃতীয় আরেকজন কন্যা থাকত তাহলে তাকেও তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতাম।" তাই প্রশ্ন করা যায়, দুজনকে বাদ দিয়ে বিশেষভাবে কেবলমাত্র হযরত আলী (রাঃ)-এর ব্যাপারে আয়াত নাযিল হবার যৌক্তিকতা কী? আলী ফাতিমার বিয়ে তো কোন বিতর্কিত, গোপন বা অসম্ভব ব্যাপার ছিল না যে এজন্য আয়াত নাযিল করে এর প্রতি সমর্থন জানাতে হবে। আরো বলা যায়, 'আলাম নাশরাহ্' সূরার বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর সাথে আলোচ্য বাক্যটির সামঞ্জস্যহীনতাই কি প্রমাণ করে না যে, ইহা মানুষের তৈরী একটি আয়াত।

শিয়াদের শীর্ষ স্থানীয় ইরানী আলেম ও গ্রন্থকার শায়খ আবু মনসুর আহমদ বিন আলী বিন আবু তালিব তবরিযী (মৃত্যু ৫৮৮ হিঃ) স্বীয় গ্রন্থ الاحتجاج على اهل اللجاج। (বিপথগামীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ)-এর এক স্থানে জনৈক যুক্তিবাদী নাস্তিকের সাথে হযরত আলীর দীর্ঘ কথোপকথন উদ্ধৃত করেছেন। সংলাপটি এত দীর্ঘ যে, ভাষান্তর করা হলে এটি একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা হয়ে যাবে। দীর্ঘ এ সংলাপে তার্কিক নাস্তিক হযরত আলীর নিকট কুরআন মজীদের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। হযরত আলী (রাঃ) একে একে এগুলোর জবাব দিয়েছেন। তন্মধ্যে তার একটি প্রশ্ন ছিল সূরা 'নিসা'র তিন নম্বর আয়াতটি সম্পর্কে। আয়াতটি এইঃ

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتمى فانكحوا ماطاب لكم من النّساء مثنى وثلث وربع الاية -

আর যদি তোমাদের আশংকা থাকে যে, তোমরা এতীমদের উপর ন্যায় বিচার করতে পারবে না, তাহলে যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের মনঃপূত হয় তাদের মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চারজনকে বিয়ে করে নাও ..... (সূরা নিসা-৩) সে বলল, এ আয়াতটিতে শর্তের সঙ্গে তার জবাবের তথা প্রথম অংশের সঙ্গে পরবর্তী অংশের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, এতীমদের উপর ন্যায় বিচার এবং স্ত্রীলোক বিবাহ করার মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই। হযরত আলীর মুখ দিয়ে আল-ইহতিজাজ গ্রন্থে এ প্রশ্নের যে জবাব দেওয়ানো হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

هو ماقدمت ذكره من اسقاط المنافقين من القرآن بين القول " فى اليتامى " وبين نكاح النساء من الخطاب، والقصص أكثر من ثلث القرآن ـ

পূর্বে আমি যে কথা উল্লেখ করেছি ইহা তারই একটি প্রমাণ। মুনাফিকরা কুরআন থেকে অনেক কিছু বাদ দিয়েছে। এ আয়াতের فى اليتمى এবং فانكحوا শব্দ দুটির মধ্যেই তারা এ কাজটি করেছে। এ বাদ দেওয়া অংশ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক ছিল। এতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ও কাহিনী ছিল। (পৃঃ ১২৮)। নাস্তিকের আক্রমণ থেকে কুরআনকে রক্ষা করার জন্য হযরত আলী (রাঃ) এখানে যা বলেছেন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কুরআনের বিভিন্ন স্থানে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসংলগ্নতা দৃষ্ট হয় তার জন্য দায়ী আল্লাহ নয় বরং সেই সব মুনাফিক যারা এতে কাটছাঁট করেছে। (১)

উপরোল্লিখিত বক্তব্যকে হযরত আলীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা তাঁর নিষ্কলংক চরিত্রের উপর শিয়াদের মিথ্যা দোষারূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এর অন্যতম প্রমাণ এই যে, তিনি আপন খিলাফতকালে মুসলমানদের নিকট এ স্থান থেকে কুরআন শরীফের এক-তৃতীয়াংশ বিলুপ্ত হবার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেননি অথবা তিনি বাদ দেওয়া অংশটুকু স্বস্থানে পুনর্বহাল করা এবং তদনুযায়ী আমল করার ব্যাপারেও মুসলমানদের নির্দেশ প্রদান করেননি। অথচ এটি তার দায়িত্ব ছিল এবং অবশ্যই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন---যদি শিয়াদের কথামতো কুরআন শরীফে কাটছাঁট করা হয়ে থাকতো। কিন্তু যেহেতু আদৌ এমন কিছু ঘটেইনি তাই হযরত আলীও এ ধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

---

(১) আবু মনসুর তবরিযী 'মুনাফিক' বলে রসূলুল্লাহর সেই সব সাহাবীকে বুঝাতে চেয়েছেন যাঁরা ইসলাম প্রচার ও কুরআন লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ইসলামের প্রথম তিন খলীফার আমলে সংরক্ষিত, সংকলিত এবং লিপিবদ্ধ কুরআনের উপরই আমল করে গেছেন চতুর্থ খলীফা হযরত আলী তাঁর শাসনামলে। যদি 'আল-ইহতিজাজ আলা আহলিল্লিজাজ' গ্রন্থে হযরত আলীর উপর মিথ্যা আরোপিত আলোচ্য বক্তব্যটি সত্যিই তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত হয়ে থাকতো তবে তা তাঁর তরফ থেকে ইসলামের প্রতি একটি খেয়ানত হিসাবে বিবেচিত হতো। বলা হতো যে, তিনি জেনেশুনে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন গোপন রাখেন। এর উপর নিজে আমল করেননি এবং অন্যদেরও আমল করতে বলেননি। অথচ স্বীয় শাসনামলে তা প্রকাশ করা এবং তদনুযায়ী আমল করার পথে কোনই বাধা ছিল না। সুতরাং স্বেচ্ছায় কুরআনের এ অংশটুকু গোপন রাখা কুফরীর নামান্তর হতো যদি সত্যি সত্যি তিনি অনুরূপ অসম্ভব উক্তি করে থাকতেন। এ থেকে পাঠকবর্গ আরো জানতে পারবেন যে, আবু মনসুর তবরিযী নিজ গ্রন্থের মাধ্যমে স্বয়ং হযরত আলীকে অভিযুক্ত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়েছেন এবং রসূলুল্লাহর অন্যান্য সাহাবীদের প্রতি কটূক্তি ও মুনাফেকী আরোপ করার পূর্বে অপবাদ ও খেয়ানত আরোপ করেছেন। হযরত আলীর পূত-পবিত্র চরিত্র নিঃসন্দেহে এসব থেকে মুক্ত।

আজ থেকে একশ' বছরেরও অধিককাল পূর্বে আল্লামা নূরী তবরিযীর
فصل الخطاب فى اثبات تحريف كتاب رب الارباب -
কিতাবটি, যা স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের উপর অজস্র মিথ্যা কথনের সর্ববৃহৎ দলিল, ইরানসহ শিয়া দেশসমূহে প্রকাশিত ও প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের শত্রু খৃষ্টান মিশনারীরা আনন্দে মেতে উঠে এবং অনতিবিলম্বে তারা বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ করে ফেলে। একথা মুহাম্মদ মাহদী ইস্পাহানী কাযেমী তাঁর احسن الوديعة নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের ৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থটি মূলতঃ শিয়াদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় কিতাব روضات الجنّات এর একটি পরিশিষ্ট।

আল-কুরআনে বিকৃতি সম্পর্কে এখানে আল্লামা কুলায়নি রচিত শিয়াদের বুখারী 'আল-জামিউল-কাফী' নামক গ্রন্থের দু'টি স্পষ্ট উদ্ধৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম উদ্ধৃতিটি ইরানে মুদ্রিত ১২৭৮ হিজরী সংস্করণের ৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে।

জাবের আল-জা'ফি থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ আমি আবু জাফর আলাইহিস সালামকে বলতে শুনেছি, "নিত্যন্ত মিথ্যাবাদী ব্যতীত কোন লোক কখনো একথা দাবী করতে পারে না যে, সে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে হুবহু সেভাবে সংকলন করেছে। অবিকল অবস্থায় সংকলন ও সংরক্ষণ করেছেন একমাত্র হযরত আলী বিন আবু তালিব এবং তাঁর পরবর্তী ইমামগণ।

এ উদ্ধৃতি সম্পর্কে আহলে সুন্নাহর বক্তব্য এই যে, নিশ্চয়ই শিয়ারা আবু জাফর অর্থাৎ ইমাম বাকের (রাঃ)-এর উপর এ রিওয়ায়েতটিতে মিথ্যা আরোপ করেছে। হযরত আলী (রাঃ) নিজেই তার প্রমাণ। কারণ, তিনি আপন খিলাফতকালে কুফায় থাকা অবস্থায় কেবলমাত্র সেই মসহাফের উপর আমল করেছেন আল্লাহ তায়ালা যার সংকলন, সংরক্ষণ, প্রচার-প্রসার এবং হিফাজত করার তৌফিক তাঁরই এক দ্বীনি ভাই হযরত ওসমান (রাঃ)-কে দান করেন। আর যদি হযরত আলীর নিকট ইহা ছাড়া অন্য কোন মসহাফ থাকতো তাহলে নিশ্চয় তিনি সর্ব প্রথম নিজে এর উপর আমল করতেন এবং তদানুযায়ী আমল করার জন্য তৎকালীন মুসলমানদের নির্দেশ দিতেন। কেননা, তিনি নিজেই ছিলেন তখন মুসলমানদের খলীফা এবং ইসলামী জগতের একমাত্র শাসক। এমতাবস্থায় তাঁর নিকট যদি অন্য কোন মসহাফ থাকতো আর তিনি গোপন রাখতেন তাহলে মুসলমানদের নিকট তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও দ্বীনে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকরূপে চিহ্নিত হতেন।

এ মিথ্যা ও বানানো উক্তিটির বর্ণনাকারী জাবের আল–জাফী শিয়াদের নিকট বিশ্বস্ত হলেও মুসলিম ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের নিকট সে মিথ্যাবাদী হিসাবে পরিচিত। আবু ইয়াহইয়া আল–হিমানী বলেনঃ আমি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)–কে বলতে শুনেছিঃ "আমি যাদের দেখেছি তন্মধ্যে 'আতা'র চেয়ে উত্তম কাউকে দেখিনি এবং জাবের আল–জাফী থেকে মিথ্যাবাদী আর কাউকে দেখিনি।" (১)

দ্বিতীয় উদ্ধৃতি এইঃ عن هشام بن سالم : عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ان القران الذى جاء به جبريل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وآله سبعة عشر ألف آية -

হিশাম ইবনে সালেম আবু আবদুল্লাহ আলাইহিস সালাম অর্থাৎ ইমাম জাফর সাদেক থেকে রিওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ জিবরাইল আলাইহিস সালাম যে কুরআন নিয়ে মুহাম্মদ (সঃ)–এর নিকট এসেছিলেন তাতে ১৭০০০ (সতের হাজার) আয়াত ছিল। (আল–কাফী পৃঃ ৬৭১)। এ রিওয়ায়েতটি যেহেতু অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর এবং বিতর্কমূলক, তাই আল–কাফীর ব্যাখ্যাকার আল্লামা কাযভিনী এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেনঃ

مراد اینست که بسیاری ازاں قرآن ساقط شده ودر مصاحف مشهور نیست -

ইমাম জাফর সাদেকের উক্তির অর্থ এই যে, জিবরাইলের আনীত কুরআন থেকে অনেক অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তা কুরআনের প্রসিদ্ধ কপিসমূহে নেই।

আল–জামিউল–কাফী (সংক্ষিপ্ত নাম আল–কাফী) গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে এভাবে باب انه لم يجمع القرآن الا الائمة عليهم السلام - অর্থাৎ, সমগ্র কুরআন ইমামগণ ব্যতীত কেউ সংকলন করেননি, –এ সম্পর্কিত অধ্যায়। এ অধ্যায়ে একাধিক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে সংক্ষেপে তা এইঃ হযরত আলী (রাঃ) যে কুরআন সংকলন করেছিলেন সেটিই ছিল রসূলুল্লাহ কর্তৃক আনীত কুরআনের অনুরূপ এবং তা ছিল বর্তমান কুরআন থেকে ভিন্নতর। সেটি হযরত আলীর কাছেই ছিল এবং তাঁর পরে পরবর্তী শিয়া ইমামগণের কাছে ছিল। এখন তা অন্তর্হিত ইমামের কাছে রয়েছে। তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করবেন সেই কুরআনও সঙ্গে নিয়ে আসবেন। এ সম্পর্কে আল–কাফীর 'ফযলুল কুরআন' শীর্ষক অধ্যায়ের একটি রিওয়ায়েতে

(১) দেখুন মাজাল্লাতুল আযহার পৃঃ ৩০৭ সন ১৩৭২ হিঃ

Contents

দেখুনঃ ইমাম জাফর সাদেক বলেন, "যখন হযরত আলী (আঃ) কুরআন সংকলন সমাপ্ত করেন তখন তিনি লোকদেরকে (আবু বকর , ওমর, ওসমান প্রমুখকে) বললেনঃ ইহা আল্লাহর কিতাব। এটি ঠিক তাই যা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)–এর উপর আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন। আমি এটি লওহায়ন (ফলকদ্বয়) থেকে সংকলিত করেছি। তখন তারা বললঃ আমাদের নিকট তো পূর্ণাঙ্গ মসহাফ বিদ্যমান রয়েছে। এটিই প্রকৃত কুরআন। তোমার সংকলিত এ কুরআনের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। হযরত আলী (আঃ) তখন বললেনঃ আল্লাহর কসম, আজকের দিনের পর তোমরা কখনো এটা দেখতে পাবে না। (৬৭১ পৃঃ)।

পূর্ববর্তী শিয়া উলামা ও আইম্মাদের সকলেই আল–কুরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রবক্তা ও দাবীদার। আল্লামা নূরী তবরিযী পরিবর্তনের প্রবক্তা পূর্ববর্তী আলেমগণের মধ্যে আবু জাফর ইয়াকুব কুলাইনী এবং তাঁর শিক্ষক শায়খ আলী ইবনে ইবরাহীম কুমীর নামও উল্লেখ করেছেন। এ দু'জনই শিয়াদের দ্বাদশতম ইমামের গায়বতে সুগরার সম্পূর্ণ সময়কাল পেয়েছেন। কোন কোন শিয়া লেখকদের মতানুযায়ী তাঁরা উভয়েই একাদশতম ইমাম হাসান আসকারীরও কিছু সময় পেয়েছেন। আল্লামা তবরিযী তাঁর 'ফসলুল খিতাব' গ্রন্থের একস্থানে স্বতন্ত্র ভাবে একথা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, তওরাত ও ইঞ্জিলের মতই কুরআনে পরিবর্তন হয়েছে। তিনি কোন রাখঢাক না রেখেই স্পষ্ট করে বলেন যে, ইসলামের প্রথম তিনজন মুনাফিক খলীফা মুসলমানদের শাসন ক্ষমতা দখল করার পর কুরআনে পরিবর্তন সাধনের ব্যাপারে সেই পদ্ধতির অবলম্বন করে যে পদ্ধতিতে বনী ইসরাইল তওরাত ও ইঞ্জিলে পরিবর্তন করেছিল।

এখানে প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, স্পেন মুসলমানদের শাসনাধীনে থাকাকালীন প্রখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম সেখানকার খৃষ্টান পাদ্রীদের সাথে তওরাত ও ইঞ্জিলের বিভিন্ন উদ্ধৃত অংশ নিয়ে তর্কে লিপ্ত হতেন এবং এগুলির বিকৃতির সমর্থনে যুক্তি–প্রমাণাদি পেশ করতেন। জবাবে পাদ্রীরা তাঁর কথার প্রতিবাদ করে বলতো যে, শিয়াদের মতে তওরাত ইঞ্জিলের মত কুরআনেও বিকৃতি ঘটেছে। তাঁদের এ যুক্তির উত্তরে ইবনে হাযম একবার বলেছিলেনঃ শিয়াদের দাবী কুরআনের এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে দলিলরূপে গৃহীত হতে পারে না। কারণ, শিয়ারা মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত নয়। (১)

---

(১) দেখুন, ইবনে হাযম রচিত পৃষ্ঠাঃ ৭৮, ২য় খণ্ড ও পৃঃ ১৮২, ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কায়রো।

Contents

সাহাবা ও মুসলিম শাসকদের প্রতি শিয়াদের মনোভাব

অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর একটি বিষয়ের প্রতি আমরা এখানে ইসলামী উম্মাহ ও মুসলিম সরকারগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা এইযে, দ্বাদশ ইমামপন্থী শিয়াদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় বিশ্বাস হচ্ছে ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ) মুর্তযার শাসনকাল ছাড়া রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইনতিকালের পর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে যত ইসলামী হুকুমত (খিলাফত, সালতানাত ও সাম্রাজ্য) প্রতিষ্ঠিত ও অতিবাহিত হয়েছে সবই ছিল অবৈধ সরকার। কোন শিয়ার পক্ষেই সেই সব সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও স্বীকৃতি প্রদান জায়েয নহে। বরং তার কর্তব্য হল ঐ সকল সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং যতটুকু সম্ভব এগুলোর সাহচর্য ও প্রভাব থেকে দূরে থাকা। কেননা, এ জাতীয় সরকার যা অতীতে ছিল·বর্তমান আছে অথবা ভবিষ্যতে হবে-সবই হল দখলদার ও অবৈধ সরকার। কথাটি অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটিই বাস্তবতা, অনুরূপ বিশ্বাসের উপরই শিয়া মযহাবের ভিত্তি।

শিয়া মযহাবের বিধান এবং শিয়াদের আকীদা অনুযায়ী মুসলমানদের বৈধ শাসক একমাত্র তাদের বারজন ইমামই-আর কেউ নয়। সমাজে তাঁদের সরাসরি শাসনকাল পরিচালনার সুযোগ ঘটে থাকুক আর নাইবা থাকুক। এঁদের ছাড়া হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত আর যাঁরাই মুসলমানদের শাসনভার গ্রহণ করেছেন, তাঁরা যতই ইসলামের খিদমত করুন না কেন এবং ইসলামের প্রচার-প্রসার, ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও সারা বিশ্বে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যতই আত্মত্যাগ করুন না কেন, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরা সবাই ফিতনা সৃষ্টিকারী, অন্যায় দখলদার ও অত্যাচারী শাসক হিসেবে আখ্যায়িত হবেন। প্রকৃতপক্ষে শিয়া ইমামিয়া ইসনা আশারিয়া' মযহাবের ভিত্তিই এ আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর জীবদ্দশায়ই আল্লাহর নির্দেশক্রমে হযরত আলী (রাঃ) কে আনুষ্ঠানিকভাবে আপন স্থলাভিষিক্ত, ভাবি খলীফা এবং মুসলমানদের

ইমাম ও নেতা মনোনীত করে গিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহর ওফাতের পর আবু বকর, ওমর, ওসমান ও তাঁদের সমর্থক সাধারণ সাহাবীগণ চক্রান্ত করে ঘোষিত ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করে দিলেন। এরই অপরিহার্য ফলশ্রুতি স্বরূপ পরবর্তীতে হযরত আলীর (রাঃ) বংশধরেরা তাঁদের ন্যায্য পাওনা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

এ কারণেই শিয়ারা সাধারণভাব সাহাবায়ে কেরাম এবং বিশেষভাবে হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান (রাঃ) কে বিশ্বাসঘাতক ও মহা অপরাধী খেতাবে ভূষিত করেছে। তাঁদেরকে মুরতাদ,কাফির, মুনাফিক, জাহান্নামী, অভিশপ্ত ইত্যাদি জঘন্য বিশেষণেবিশেষিতকরেছে।

তাই ইমাম আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন মূসার উপর মিথ্যা আরোপ করে বলেছে যে, তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারুককে "জিবত" ও "তাগুত" (কুরাইশদের দু'টো প্রখ্যাত মূর্তির নাম) বলে আখ্যায়িত করেছেন। শিয়াদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে এমন প্রচুর রিওয়ায়েত রয়েছে যেগুলোতে কাফির–মুশরিকদের ব্যাপারে নাযিলকৃত আল–কোরআনের একাধিক আয়াতের ব্যাখ্যায় শিয়া ইমামগণ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সেগুলো আবু বকর, ওমর ও ওসমান সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কারণ, শিয়াদের মতে এ তিনজন প্রকাশ্যে ঈমানের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি এবং মুনাফিক ও কাফির অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়েছে(নাউযুবিল্লাহ)।

অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত হচ্ছে সূরা নিসার ১১৭ নম্বর আয়াত সম্পর্কিত। আয়াতটি এইঃ

ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا
كفرا لم يكن الله ليغفرلهم -

(যারা ঈমান এনেছে অতঃপর কাফির হয়ে গেছে, আবার ঈমান আনয়ন করেছে আবার কাফির হয়ে গেছে এবং কুফরের দিকে আরো বেশী করে এগিয়ে গেছে, আল্লাহ তায়ালা কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না)। আল–জামিউল কাফীর ২৬৫ পৃষ্টায় এ আয়াতটি উদ্ধৃত করে ইমাম জাফর সাদেকের যবান মুবারক দিয়ে এর যে তফসীর পেশ করা হয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর, লোমহর্ষক। ইমাম বলেন "এ আয়াতটি অমুক, অমুক ও অমুক (আবু বকর, ওমর ও ওসমান) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এরা তিনজনই গোড়ার দিকে রসূলুল্লাহর (সঃ) প্রতি ঈমান আনয়ন করে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ওফাতের কিছুদিন পূর্বে হযরত আলীর ইমামতের উপর বয়আত

করতে তাদের বললেন, তখন তারা তা মানতে অস্বীকার করল এবং এভাবে কাফের হয়ে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহর কথায় তারা বয়আত করল ও ঈমান আনলো। অবশেষে রসূলুল্লাহর ওফাতের পর তারা আবার বয়আত অস্বীকার করে কাফির হয়ে গেল এবং কুফরীর মধ্যেই রয়ে গেল।"

বাস্তবতা যে অনেক সময় কল্পনাকেও হার মানায় সম্মানিত পাঠকবর্গ তা শিয়া আলেমদের সূরা হুজুরাতের সাত নম্বর আয়াতটির তফসীর থেকে বুঝতে পারবেন। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের উপর বল্গাহীন মিথ্যা ও অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে মানুষ যে কত নির্ভীক, নির্মম হতে পারে আয়াতটির শিয়া তফসীর তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আয়াতটি এইঃ

ولكنّ الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه فى قلوبكم

وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان۔

"আল্লাহ তায়ালা ঈমানকে তোমাদের নিকট প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে ঈমানের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তোমাদের অন্তরে কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করে দিয়েছেন।" আল-কাফীর রিওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম জাফর সাদেক এ আয়াতের তফসীর প্রসংগে বলেন, এ আয়াতে ঈমান শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ) কে, কুফর শব্দ দ্বারা প্রথম খলীফা (আবু বকর), ফুসুক (পাপাচার) শব্দ দ্বারা দ্বিতীয় খলীফা (ওমর) এবং ইসয়ান (অবাধ্যতা) শব্দ দ্বারা তৃতীয় খলীফা (ওসমান) কে। (আল-কাফী পৃঃ ২৬৯)।

বিশিষ্ট শিয়া লেখক আল্লামা আয়াতুল্লাহ আল-মাসকানী ১৩৫২ হিজরীতে নজফের মুরতাযাভী প্রেস থেকে মুদ্রিত সমালোচনা ও সমন্বয়ের উপর তাঁর সুপ্রসিদ্ধ "তনকীহুল মকাল ফী আহওয়ালির রিজাল" গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ২০৭ পৃষ্ঠায় প্রখ্যাত শিয়া গ্রন্থকার আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস আল-হালাবীর 'আল-সারাইর' নামক গ্রন্থ থেকে একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। চিঠিটির প্রেরক মুহাম্মদ বিন আলী বিন ঈসা এবং প্রাপক মওলানা আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন মূসা আলাইহিসসালাম। পত্র লেখক বলেন, আমি তাঁকে 'নাসেব' (অর্থাৎ আহলে বাইতের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি) সম্পর্কে জানতে চেয়ে চিঠি লিখলামঃ কোন ব্যক্তি যদি 'জিবত' ও 'তাগুত' কে প্রধ্যান্য দেয় (অর্থাৎ রসূলুল্লাহর দুই সাথী হযরত আবু বকর ও ওমরকে অন্যদের উপর প্রধান্য দেয়) এবং তাদের নেতৃত্বে বিশ্বাসী হয় তবে তাকে পরীক্ষা করার জন্য আরো কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি? জবাব আসল ঃ "যে

এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে সে 'নাসেব'। (১) অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে আহলে বাইতের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে হযরত আবু বকর ও ওমর ফারুককে বিশেষ মর্যাদা দান করে এবং তাঁদের খিলাফত স্বীকার করে। এ দু'জনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোন ব্যক্তি কস্মিনকালেও আহলে বাইতের বন্ধু হতে পারেনা।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দুই কুরাইশ প্রতিমা জিবত ও তাগুত বলতে শিয়ারা ইসলামের প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফাকে বুঝিয়ে থাকে। নামাযের পর ও বিশেষ অনুষ্ঠানে পঠিত দোয়ার মধ্যে তারা রীতিমত জিবত ও তাগুতের প্রতি অভিশাপ প্রেরণ করে থাকে।

এ দোয়াটি তাদের দোয়ার কিতাব ' মিফতাহুল জিনান' গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত রয়েছে। দোয়াটি এরূপঃ

اللّهم صلّ على محمد وعلى آل محمد ، والعن صنمى قريش
وجبتهما وطاغوتيهما وابنتيهما -- الخ

(হে আল্লাহ, রহমত বর্ষণ কর মুহাম্মদের উপর ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর এবং আভিশাপ নাযিল কর দুই কুরাইশ প্রতিমা, জিবত ও তাগুত, আর তাদের দুই মেয়ের উপর)। দুই মেয়ে বলতে তারা বুঝায় উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর ও হযরত হাফসা বিনতে ওমর ফারুককে। (আল্লাহ তাঁদের সকলের উপর রহমত বর্ষণ করুন)।

ঘৃণা ও শত্রুতার কারণে শিয়ারা ইসলামের প্রথম তিন খলীফা এবং রসূলুল্লাহর প্রধান প্রধান ও সাধারণ সাহাবীগণকে গালি দিয়ে যে শুধু তৃপ্তি পায় তা-ই নয়, বরং তাঁদের কাফির, মুরতাদ, খেয়ানতকারী, জাহান্নামী ও অভিশপ্ত মনে করা শিয়াদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংগ। আল্লামা কুলাইনী 'কিতাবুর রওদাহ' গ্রন্থে একটি রিওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। এ রিওয়ায়েত জনৈক বিশ্বস্ত মুরীদ কর্তৃক হযরত আবু বকর ও ওমর সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে ইমাম বাকের বলেনঃ "এ দু'জন সম্পর্কে কী জানতে চাও? আমাদের আহলে বাইতের প্রত্যেকেই তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। প্রত্যেকেই স্বীয় বংশধরদের এদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করার ওসিয়ত করে গেছেন। তারা উভয়েই আমাদের ন্যায্য অধিকার হরণ করেছে। সর্বপ্রথম তারাই আমাদের আহলে বাইতের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে। আমাদের বালা মুসিবতের ভিত্তি তৈরী করেছে। সুতরাং তাদের উভয়ের প্রতি আল্লাহর

(১) 'নাসেব' শিয়া মসহাবের একটি বিশেষ পরিভাষা। 'নাসেব' বলে তারা সেই ব্যক্তিকে বুঝিয়ে থাকে যে শায়খায়ন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারুককে, খলিফা বলে মানে এবং শিয়ারা হযরত আলীর ইমামতের প্রতি যে ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে, সেভাবে বিশ্বাস রাখেনা, যদিও তাঁকে চতুর্থ খলীফায়ে রাশেদ বলে মানে। মোল্লা বাকের মজলিসী 'হককুল ইয়াকীন' গ্রন্থে নাসেবদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তাদের পরিণতি হবে তাই, যা কাফিরদের হবে। তারা অনন্তকাল দোযখে থাকবে। (পৃঃ ১-১১)।

ফেরেশতাগণের এবং সকল মানুষের লানত।" এই একই গ্রন্থে কুলাইনী নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে একটি দীর্ঘ রিওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। অত্যন্ত দীর্ঘ এ হাদীসের শেষাংশে রসূলুল্লাহর ওফাতের অব্যবহিত পর প্রথমে 'সকীফা বনী সায়েদায়' ও পরে মসজিদে নববীতে হযরত আবু বকরের খিলাফতের ব্যাপারে বাইয়াত অনুষ্ঠানের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে হযরত আলী বলেছিলেন যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম আবুবকরের হাতে বাইয়াত করে সে ছিল বৃদ্ধ মানুষের ছদ্মবেশধারী ইবলীস। হযরত আলী আরো বলেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) নাকি পূর্বাহ্নেই তাঁকে একথা বলে গিয়েছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ) । বলা বাহুল্য, কুলাইনীর এ কল্পিত রিওয়ায়েত হযরত আলীর উপর মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর কিছুইনয়।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর বিন খাত্তাবের শাসনামলে এবং তাঁর সক্রিয় নেতৃত্বে পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের পদানত হয়। সামরিক বিজয় অর্জনের পর তিনি পারস্য তথা ইরানে ইসলাম প্রচারের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ইরানের ভূমি থেকে তিনি অগ্নি উপাসনার মুলোৎপাটিত করেন এবং অগ্নি উপাসকদের ইসলামে প্রবেশ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে ইরানে চিরতরে মজুসী ধর্মের বিলুপ্তি ঘটে। এজন্যই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক হযরত ওমর ফারুকের প্রতি শিয়াদের বিদ্বেষ–মাত্রা এতদূর পৌঁছে যে, তার হত্যাকারী মজুসী আবু লুলুকে তারা 'আবু শুজা উদ্দিন' (ধর্ম–বীরের পিতা) উপাধিতে ভূষিত করেছে। জনৈক শিয়া আলেম আলী বিন মুযাহির নেতৃস্থানীয় শিয়া বুযুর্গ ও প্রচারক শায়খ আহমদ বিন ইসহাক আল কুমী থেকে বর্ণনা করেন যে, ওমর বিন খাত্তাবের হত্যার দিনটি (৯ই রবিউল আওয়াল) শিয়াদের নিকট প্রকৃতপক্ষে বড় ঈদের দিন। খুশীর দিন, পবিত্র দিন, বরকতের দিন ও সান্ত্বনা লাভের দিন।

চরম লজ্জা এবং বিস্ময়ের ব্যাপার হলেও সত্য যে, হিজরী দশম–একাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ট শিয়া মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা মোল্লা বাকের মজলিসী তাঁর গ্রন্থসমূহের যেখানেই হযরত ওমর ফারুকের নাম উল্লেখ করেছেন সেখানেই তাঁর নামটি লিখেছেন এভাবে عمر بن الخطاب عليه اللعنة والعذاب - (অর্থাৎ ওমর ইবনুল খাত্তাব তার উপর লা'নত ও আযাব)। জনপ্রিয় এ শিয়া মুহাদ্দিস তাঁর 'যাদুল মায়াদ' গ্রন্থে হযরত ওমর ফারুকের শাহাদাত দিবস ৯ই রবিউল আওয়ালের ফযিলত ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে একটি হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। হাদীসটি এত দীর্ঘ যে 'যাদুল

মায়াদের' সুপরিসর চার পৃষ্ঠা ব্যাপী এটা বিস্তৃত রয়েছে। হাদীসটি রিওয়ায়েত করেছেন শিয়াদের একাদশ ইমাম হাসান আসকারী তাঁর পিতা দশম ইমাম আলী নকী থেকে, তিনি বিশিষ্ট সাহাবী হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান থেকে, তিনি স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, ৯ই রবিউল আওয়াল তারিখে আল্লাহ তায়ালা তাঁর, তাঁর পরিবার ও বংশধরের দুশমনকে ধ্বংস করবেন এবং ফাতেমা যুহরার বদ্‌দোয়া কবুল করবেন। দিনটি আহলে বাইত ও শিয়াদের ঈদ পালনের দিন। দিনটির সম্মানে সেদিন ও তার পরবর্তী দুই দিন ফেরেশতারা শিয়াদের যেকোন ধরনের গোনাহ লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবেন। যারা সেদিন ঈদ উদযাপন করবে আল্লাহ তায়ালা তাদের আরশ প্রদক্ষিণকারী ফেরেশতাদের সমান সওয়াব দিবেন, (নাউযুবিল্লাহ)। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, 'মজলিসী' হাদীসটিকে 'হাদীসে কুদসী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

অনুরূপভাবে শিয়া গ্রন্থাবলীর শত শত জায়গায় হযরত ওমর (রাঃ) কে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর বংশধরের দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অনেক জায়গায় হযরত আলীর সংগে হযরত ওমরের চরম শত্রুতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। হযরত ফাতেমার উপর তাঁর অত্যাচারের কল্পিত কাহিনী রচনা করা হয়েছে। উপরোক্ত হাদীসে যা বলা হয়েছে কোন মুসলমান এমনকি ইসলামের কোন শত্রুর পক্ষেও কি তা কল্পনা করা সম্ভব? এ রিওয়ায়েতটি কি যুগপৎভাবে আল্লাহ, তাঁর রসূল, বুযুর্গ সাহাবী হুযাইফা এবং শ্রদ্ধেয় হাসান আসকারী ও তাঁর পিতা আলী নকীর উপর মিথ্যাচার ও অপবাদের ঘৃণ্যতম দৃষ্টান্ত নয়?

কুলাইনী তাঁর 'কিতাবুর রওদায়' ইমাম বাকেরের একটি রিওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। রিওয়ায়েতটিতে ইমাম বাকের বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর ইন্তিকালের পর সকল সাহাবীই মুরতাদ হয়ে গেছে–কেবল তিনজন মুরতাদ হননি। এ তিনজন হলেন মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, আবু যর গিফারী এবং সালমান ফারসী। (পৃঃ ১১৫)। মূল রিওয়ায়েতটি দেখুনঃ

قال كان الناس أهل ردة بعد النبى صلى الله عليه و الـه
الا ثلاثة فقلت ومن الثلاثة فقال المقداد بن الأسود وأبو
ذر الغفارى و سلمان الفارسى رحمة الله عليهم وبركاته-

এরূপ বিশ্বাসপোষণকারীর সাথে কি ইসলামের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে?

বাস্তবে এমন কিছু ঘটে থাকলে কি আজো ইসলাম নামক সৌধটি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো? এরূপ বিশ্বাসকারীর দিলে কি আল্লাহ, রসূল ও কুরআনের কোন গুরুত্ব অবশিষ্ট থাকতে পারে? শিয়া–সুন্নী মিলনের এই কি আলামত? প্রকৃতপক্ষে ইমাম বাকের কখনো এমন কথা বলতে পারেন না। আপন পূর্বপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)–এর সারা জীবনের সাধনা ও সাফল্যকে তিনি এভাবে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারেন না। এগুলোই হচ্ছে নিজেদের ইমামদের বিরুদ্ধে শিয়া আলেমদের মিথ্যাচারেরনমুনা।

প্রকৃতপক্ষে মনগড়া এসব রিওয়ায়েত ইসলামের বিশ্বাসযোগ্যতাকে অস্বীকার করারই নামান্তর। এমনও হতে পারে যে, মানুষের মনে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহের বীজ বপন করাই অনুরূপ মিথ্যাচারের উদ্দেশ্য। একদিকে ইসলামের মহীরূহকে সমূলে উৎপাটিত করার এ ষড়যন্ত্র এবং অপরদিকে শিয়া–সুন্নী ঐক্যের শ্লোগান কি দূরভিসন্ধির পরিচায়ক নয়? আমরা সুন্নীরাও ঐক্য চাই। কিন্তু ঐক্য হতে হবে ধর্মকে কায়েম রেখে–বিসর্জন দিয়ে নয়।

শিয়াদের রজআত বা পুনরাবির্ভাব—এর বিশ্বাস

হযরত আবু বকর সিদ্দীক, ওমর ফারুক, সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ও আরো অনেক মুসলিম বীর পুরুষ তওহীদের বাণী মুখে নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জয় করে ইসলামের সুমহান পতাকাতলে একত্রিত করেছেন এবং যাঁরা আমাদের বর্তমান সময় পর্যন্ত সেইসব দেশ ইসলামী আর্দশ অনুযায়ী শাসন করে এসেছেন, শিয়া আকীদা অনুযায়ী তাঁদের সকলেই দখলদার ও অত্যাচারী শাসক। মৃত্যুর পর তাঁদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কেননা, তাঁরা সবাই জবরদখলকারী ও অবৈধ শাসক। এজন্যই তাঁরা শিয়াদের আনুগত্য, সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়ার অযোগ্য। হাঁ, ততটুকু পেতে পারেন যতটুকু শিয়াদের 'তাকিইয়া নীতি'র সাথে সংগতিপূর্ণ এবং রাষ্ট্রের উপকার গ্রহণ ও শাসকদের অপকারিতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন। কিন্তু কোন অবস্থায়ই শিয়ারা দিল থেকে তাঁদের সমর্থন ও শ্রদ্ধা করতে পারেনা এবং কোনদিন করেও নি।

শিয়াদের অন্যতম মৌলিক আকীদা অনুযায়ী দ্বাদশতম অন্তর্হিত ইমাম বা প্রতীক্ষিত মেহদী যখন তাঁর এগার শতাধিক বছরের দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে সমাজে আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন ইসলামের শুরু থেকে নিয়ে তাঁর আর্বিভাবকালীন সময় পর্যন্ত সকল মুসলিম শাসককে জীবিত করা হবে, যাঁদের শীর্ষে থাকবেন জিবত ও তাগুত (আবু বকর ও ওমর), এবং তিনি তাঁর ও তাঁর পূর্ব পুরুষ এগারজন ইমামের নিকট থেকে জোরপূর্বক শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার অপরাধে সেসব শাসকদের বিচার করবেন। কেননা, রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর ওফাতের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামী শাসনক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ থেকে কেবলমাত্র এই ইমামগণেরই প্রাপ্য, এতে অন্য কারো কোন অধিকার নেই। জোরপূর্বক ক্ষমতা হরণকারী সেইসব অবৈধ শাসকদের বিচার অনুষ্ঠানের পর তাঁদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে। এক এক দফায় তিনি পাঁচশত শাসকের ফাঁসী ও হত্যার নির্দেশ দিবেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তিন হাজার শাসকের হত্যাযজ্ঞ সমাপ্ত করবেন। শায়খায়ন অর্থাৎ আবু বকর ও ওমরের লাশ কবর থেকে বের করে একটি বৃক্ষে লটকিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর তাঁদের লাশ

বৃক্ষসহ পুড়িয়ে ভস্ম করে দেওয়া হবে এবং এ ভস্ম সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। এ সবই করা হবে প্রতীক্ষিত ইমাম মেহদীর নির্দেশক্রমে।

এসব ঘটবে এ পৃথিবীতেই এবং কিয়ামতের পূর্বে। এরপর কিয়ামত ও সর্বশেষ পুনরুত্থান অনুষ্ঠিত হবে। অতঃপর হাশরের ময়দানে আল্লাহ তায়ালা মীযান কায়েম করবেন এবং ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি ঘোষণা করবেন। কেউ যাবে জান্নাতে আর কেউ যাবে জাহান্নামে। জান্নাতে প্রবেশ করবে আহলে বাইতের সদস্যবর্গ ও শিয়া মতবাদে বিশ্বাসীগণ এবং জাহান্নামে যাবে সেইসব লোক যারা শিয়া নয় এবং শিয়া ধর্মে বিশ্বাসী নয়। বিশেষতঃ পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে বিলয় পর্যন্ত মানব সমাজে যত কুফর, শিরক, পাপ, যুলুম ও অন্যায় হয়েছে সবগুলোর দায়–দায়িত্ব চাপানো হবে শায়খায়নের উপর। দিবা–রাত্রির মধ্যে এ দু'জনকে হাজার বার হত্যা করা হবে ও জীবিত করা হবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে আরো শাস্তি দেওয়ার জন্য বিশেষ স্থানে নিয়ে যাবেন।

শিয়া আলেমগণ কিয়ামতের পূর্বে ইমাম মেহদী বা অন্তর্হিত ইমামের পুনরাগমন, মৃত লোকদের জীবিত করণ ও তাদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের এ পর্যায়টিকে 'রাজআত' নামে অভিহিত করে থাকেন। এটা শিয়াদের অন্যতম প্রধান মৌলিক আকীদা। 'রজআত' শব্দটির অর্থ প্রত্যাবর্তন, পুনরাবির্ভাব, পুনরাগমন। কোন শিয়াই 'রাজআতের' প্রতি সন্দেহ পোষণ করতে পারেন না। এটা অনেকটা আমাদের 'কিয়ামতের পর পুনরুত্থানের' বিশ্বাসের অনুরূপ। শিয়ারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন তাদের প্রতীক্ষিত ইমাম মেহদী আত্মপ্রকাশ করে সুন্নী নেতৃবৃন্দ ও শাসকবর্গের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তারা বিশ্বাস করে যে, কিয়ামতের পূর্বে তাঁর আগমন অবশ্যম্ভাবী। এজন্যেই শিয়া গ্রন্থসমূহের যেখানেই অন্তর্হিত ইমামের নাম এসেছে সেখানেই তাঁর নামের শেষে "عـــج" অক্ষর দু'টি লিপিবদ্ধ রয়েছে। এটি একটি দোয়ার প্রতীক। দোয়াটি হচ্ছে عَجَّلَ اللّٰهُ فَرَجَهُ (আল্লাহ তাঁর পুনরাবির্ভাব ত্বরান্বিত করুন)।

'রজআত' আকীদা অনুযায়ী শিয়াদের প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদী যখন পুনরাবির্ভূত হবেন তখন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতেমা যুহরা, হযরত হাসান ও হুসাইন, অন্য সকল ইমাম ও বিশিষ্ট শিয়া নেতৃবৃন্দ আলমে বরযখ থেকে বের হয়ে আসবেন। অতঃপর তাঁরা ইমাম মাহদীর হাতে বায়আত করবেন। অপরদিকে হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, উম্মুল

মুমিনীন আয়েশা ও হাফসা এবং তাঁদের সহযোগী ও সমর্থক বিশিষ্ট কাফের–মুনাফিকরাও জীবিত হয়ে কবর থেকে বের হয়ে আসবেন। ইমাম মাহদী তাঁদেরকে বিশেষতঃ আবু বকর ও ওমর ফারুককে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করবেন এবং প্রকাশ্যে ও সর্বসমক্ষে তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করবেন। শিয়াদের বিশ্বাস অনুযায়ী এটি হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র হাশর যা কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত হবে এবং এতে হর্তাকর্তা, বিচারক ও রায়দাতা হবেন স্বয়ং ইমাম মাহদী।

উপরে ইমাম মাহদীর কার্যক্রম ও 'রাজআত' সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার সবকিছুই নেওয়া হয়েছে শিয়াদের বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মোল্লা বাকের মজলিসীর 'হক্কুল ইয়াকীন' গ্রন্থটির নাম। এ গ্রন্থে 'রাজআত' আকীদার উপর একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে। এ প্রসংগে এখানে 'তুহফাতুল আওয়াম' গ্রন্থটির নামও উল্লেখ করা যায়। এ গ্রন্থটিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিয়ামতের পূর্বের ক্ষুদ্র হাশরে ইমাম মাহদী আল্লাহর কতিপয় বিশেষ গুণের অধিকারী হবেন। এর ফলেই সেদিন তিনি ভাল লোকদের পুরস্কার এবং পাপীদের শাস্তি প্রদান করবেন।

'রজআত' শিয়াদের মৌলিক বিশ্বাস সমূহের অন্তর্ভুক্ত বলেই তাদের বিখ্যাত আলেম 'সাইয়েদ মুরতযা', যিনি 'আমালীল মুরতযা' নামক গ্রন্থের প্রণেতা, এ আকীদার একজন জোরদার প্রবক্তা ছিলেন। তিনি তাঁর 'আল–মাসায়েল আন–নাসিরিয়া' গ্রন্থে বলেনঃ

"ان أبا بكر وعمر يصلبان يومئذ على شجرة فى زمن المهدى وتكون تلك الشجرة رطبة قبل الصلب فتصير يابسة بعده۔"

"আবু বকর ও ওমরকে ইমাম মাহদীর যমানায় বিচারের দিন একটি বৃক্ষে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে। ক্রুশবিদ্ধ করার পূর্বে বৃক্ষটি থাকবে সজীব কিন্তু এর পরপরই এটা শুকিয়ে যাবে।"

শিয়া মযহাবের 'রজআত' 'আকীদা সম্পর্কে সম্মানিত পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা এখানে 'আশ–শায়ক আল–মুফীদ' খেতাব প্রাপ্ত শিয়াদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ধর্মগুরু আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন নু'মানের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল–ইরশাদ ফী তারীখে হুজাজিল্লাহে আলাল ইবাদ' থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করব। এ উদ্ধৃতিগুলো উক্ত গ্রন্থের ৩৯৮ থেকে ৪০২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। প্রস্তরের উপর ইরানে মুদ্রিত অতি প্রাচীন এ গ্রন্থটিতে মুদ্রণ কালের কোন তারিখ

পাওয়া যায়নি। কিন্তু এতটুকু নিশ্চিতরূপে জানা গেছে যে, এটা মুহাম্মদ আলী মুহাম্মদ হাসান আল–কালবাবকাতীর লিপিতে মুদ্রিত। উদ্ধৃতিগুলোর অনুবাদ দেখুন।

ফযল বিন শাযান বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আলী কুফী থেকে, তিনি ওহাব বিন হাফস থেকে, তিনি আবু বসীর থেকে, তিনি বলেন, আবু আবদুল্লা অর্থাৎ ইমাম জাফর সাদেক বলেছেনঃ অন্তর্হিত ইমামের নামে একদিন আহবান জানানো হবে। তাঁর নামে আহবান জানানো হবে তেইশা রাত্রিতে আর তিনি আবির্ভূত হবেন আশুরার দিন। আমি যেন আমাকে তাঁর সাথে আশুরার দিন রুকনে ইয়ামানী ও মকামে ইব্রাহিমের মাঝখানে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখছি। জিবরাইল তাঁর ডান পাশে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়ে বলছেনঃ "আল্লাহর জন্য বায়আত কর"। জিবরাইলের ডাক শুনে শিয়ারা পৃথিবীর বিভিন্ন দিক থেকে তাঁর দিকে আসতে থাকবে। তাদের পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্য জমিনকে গুটিয়ে দেয়া হবে। হাদীসে এসেছে তিনি মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে কুফা পৌছবেন। তারপর আমাদের নজফে অবতরণ করবেন। অতঃপর সেখানে থেকে তিনি চতুর্দিকে তাঁর সৈন্যদল পাঠিয়ে দিবেন।

আল–হিজাল রিওয়ায়েত করেন সা'লাব থেকে, তিনি আবু বকর হাযরামী থেকে, তিনি আবু জা'ফর আলাইহিসসালাম (অর্থাৎ ইমাম বাকের) থেকে তিনি বলেনঃ আমি যেন আত্ম প্রকাশকারী ইমাম আলাইহিসসালামের সংগে কুফার নজফে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি পাঁচ হাজার ফেরেশতা সমভিব্যাহারে মক্কা থেকে এখানে আগমন করেন। জিবরাইল তাঁর ডান পাশে, মিকাইল তাঁর বাম পাশে আর মুমিনগণ তাঁর সামনে দন্ডায়মান। তিনি বিভিন্ন এলাকায় সৈন্য প্রেরণে ব্যস্ত।

আবদুল করীম আল–জা'ফী রিওয়ায়েত করেন, আমি আবু আবদুল্লাহ অর্থাৎ জাফর সাদেককে জিজ্ঞাসা করলামঃ আবির্ভূত ইমাম কতকাল শাসন করবেন? বললেন, সাত বছর। তবে দিনগুলো এত দীর্ঘ হবে যে, তার এক বছর তোমাদের দশ বছরের সমান হবে। ফলে তাঁর শাসনকাল তোমাদের সত্তর বছরের সমান হবে। আবু বসীর তখন বললেনঃ আমি আপনার জন্য উৎসর্গ, আল্লাহ তায়ালা কিভাবে বছরগুলো দীর্ঘায়িত করবেন? বললেনঃ আল্লাহ তায়ালা আকাশকে মন্থর গতিতে চলার নির্দেশ দিবেন। ফলে দিন ও বছর দীর্ঘ হয়ে যাবে। আর যখন তাঁর আগমনের সময় ঘনিয়ে আসবে জমিনে তখন এমন ধারায় বৃষ্টিপাত হবে যা পৃথিবী এর আগে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। এ বৃষ্টির দ্বারা আল্লাহ মুমিনদের মাংস ও দেহ কবরে সজীব করে তুলবেন। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তারা শরীরের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে এগিয়ে আসছে।

আবু আবদুল্লাহ অর্থাৎ ইমাম জাফর সাদেক আলাইহিসসালাম থেকে আবদুল্লাহ বিন মুগীরা বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর বংশে জন্মগ্রহণকারী অন্তর্হিত ইমাম যখন পুনরাবির্ভূত হবেন তখন তিনি কুরাইশ বংশীয় পাঁচশত লোককে কবর থেকে উঠিয়ে তাদের শিরচ্ছেদ করবেন। তারপর আরো পাঁচশত লোককে উঠিয়ে তাদের শিরচ্ছেদ করবেন। অতঃপর আরো পাঁচশতকে, এভাবে ছয়বার এর পুনারাবৃত্তি করবেন। আমি (বর্ণনাকারী) বললামঃ তাদের সংখ্যা কি এতই বেশী হবে? (বর্ণনাকারীর কাছে এ কথা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল এ জন্য যে, খুলাফায়ে রাশেদীন, বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসসহ মুসলিম শাসকমন্ডলীর সম্মিলিত সংখ্যাও ইমাম জাফর সাদেকের সময় পর্যন্ত উপরোল্লিখিত সংখ্যার এক দশমাংশ হবেনা) । ইমাম জাফর সাদেক উত্তর দিলেনঃ "এ সংখ্যা তাদের ও তাদের সহযোগী সমর্থকদের মধ্য থেকে হবে।"

জাবির আল–জা'ফি আবু আবদুল্লাহ জাফর সাদেক থেকে রিওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ যখন আলে–মুহাম্মদের প্রতিনিধি প্রতীক্ষিত ইমাম আবির্ভূত হবেন তখন বিভিন্ন স্থানে তিনি অনেক তাঁবু স্থাপন করবেন। এই তাঁবুগুলিতে অবতীর্ণ প্রকৃত কুরআনের শিক্ষা দিবেন। (১)

সেই সব লোকের জন্য এটা এক কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দিবে যারা বর্তমানে প্রচলিত মসহাফে উসমানীর পাঠ অনুযায়ী কুরআন শরীফ মুখস্ত করছেন। কেননা এর পাঠ বর্তমান কুরআন থেকে ভিন্নতর হবে। আবু আবদুল্লাহ আলাইহিসসালাম থেকে আবদুল্লাহ বিন আজলান বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ যখন আলে–মুহাম্মদের ইমাম আবির্ভূত হবেন তখন তিনি মানব সমাজে দাউদী শাসন জারী করবেন।

"মুফাস্সাল বিন ওমর ইমাম জাফর সাদেক আলাইহিসসালাম থেকে রিওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আবির্ভূত ইমাম আলাইহিস সালামের সাথে কুফার ভূমি থেকে বের হয়ে আসবেন মূসা আলাইহিসসালামের সম্প্রদায়ের সাতাইশজন লোক, আসহাবে কাহফের সাতজন যুবক। আরো বের হবেন ইউশা' বিন নূন (আঃ), সুলায়মান (আঃ) আবু দজানা আনসারী, মিকদাদ (রাঃ) ও মালিক আশতর। এঁরা সকলেই হবেন শাসন পরিচালনায় তাঁর সাহায্যকারী।"

---

(১) এখানে প্রশ্ন করা যায়, তাঁর প্রপিতামহ হযরত আলী (রাঃ) স্বীয় খিলাফতকালে কেন এ কাজটি সম্পাদন করে যাননি? তবে কি তাঁর দ্বাদশতম পৌত্র ইসলাম ও কুরআনের খেদমতে তার চেয়েও অধিক যোগ্যতা ও আন্তরিকতার অধিকারী? প্রচলিত কুরআন ছাড়া যদি অন্য কোন কুরআন নাযিল হয়ে থাকতো তবে অবশ্যই হযরত আলী (রাঃ) আপন খিলাফতকালে তার শিক্ষা চালু করতেন।

এ সকল উদ্ধৃতি শিয়া উপরোল্লিখিত নির্ভরযোগ্য ধর্মগ্রন্থ থেকে পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে আক্ষরিকভাবে ভাষান্তর করা হয়েছে। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মিথ্যা ও কল্পিত সনদ দ্বারা বর্ণিত এসব উক্তি আহলে বাইত তথা রসূলুল্লাহর বংশধরদের উপর জঘন্য অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। বেচারা আহলে–বাইতের বড় অসুবিধা এই যে, এসব মিথ্যাচারী লোক তাঁদের স্বঘোষিত 'অনুসারী' হয়ে বসে আছে। উল্লেখ্য, আশ–শাইখ আল–মুফীদের আলোচ্য গ্রন্থটি ইরানে মুদ্রিত হয়েছে এবং এর ঐতিহাসিক কপিটি আমাদের কাছে মজুদ রয়েছে।

এ অধ্যায়ে এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে সংক্ষেপে এই হল ইসলামের প্রথম তিন খলীফা, উম্মুহাতুল মুমিনীন, সাহাবায়ে কেরাম, মুসলিম শাসকবৃন্দ, মুজাহিদীন ও মুজতাহিদীন সম্পর্কে শিয়া নেতৃবৃন্দ, ধর্মযাজকমন্ডলী ও পন্ডিতবর্গের মনোভাব ও দৃষ্টিভংগি। আমি অনেক উদারমনা ও সদয়–হৃদয়ের লোক দেখেছি, যাঁদের ধারণা, শিয়ারা পরবর্তীকালে উপরে বর্ণিত ভ্রান্ত আকীদাসমূহ থেকে সরে এসে নিজেদের ভুল–ভ্রান্তি সংশোধন করে নিয়েছে। তাঁদের এ ধারণা নিতান্ত ভুল ও বাস্তব অবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। কিঞ্চিদধিক একশত বছর আগে লিখিত আল্লামা নূরী 'তবরিযীর'ফসলুল খেতাব' গ্রন্থ থেকে যেসব উদ্ধৃতি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পরিবেশিত হয়েছে সেগুলোই একথা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। (১)

সাফাবিয়া শাসনামল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিয়ারা উপরোক্ত আকীদাসমূহ আগের চাইতে আরো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে। বর্তমানে অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত যুবসমাজের একাংশের মধ্যে একটি নতুন প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিয়া যুবকদের অনেকেই তাদের গাঁজাখুরি ধর্মীয় উপকথা

(১) বর্তমান শতকে শিয়াদের অবিসংবাদিত আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা, ইরানী বিপ্লবের সংগঠক, যুগশ্রেষ্ঠ শিয়া আলেম মুজতাহিদ ও-গ্রন্থকার ইমাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী রচিত গ্রন্থাবলীও এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর 'আল হুকুমাতুল ইসলামিয়া', 'তাহরীরুল অসীলাহ' ও 'কাশফুল আসরার' গ্রন্থসমূহ একথারই প্রমাণ বহন করে যে, শিয়ারা বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসেও তাদের আকীদা–বিশ্বাস থেকে একটুও সরে আসেনি। খোমেনী এসব গ্রন্থে অত্যন্ত খোলামেলা ভাবে তাঁর পূর্বসুরী কুলাইনী, মজলিসী ও তবরিযীর গ্রন্থসমূহের বক্তব্যের প্রত্যয়ন করে দিয়েছেন। (অনুবাদক)।

ও অবিশ্বাস্য, অযৌক্তিক প্রলাপোক্তি পরিত্যাগ করে আজকাল কমিউনিজমের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। (২) তাই দেখা যায় ইরাকের কমিউনিষ্ট পার্টি ও ইরানের 'তুদে' দল এমন সব শিয়া তরুণদের দিয়ে গঠিত যাদের নিকট শিয়াবাদের অযৌক্তিকতা, অসারতা ও কদর্যতা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। ফলে তারা শিয়াবাদ থেকে সরাসরি সাম্যবাদের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছে। এক চরম থেকে তারা গিয়েছে অন্য চরমে। তাদের মধ্যে মধ্যমপন্থী কোন দল নেই। অবশ্য এমন অনেক রয়েছে যারা সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, কূটনৈতিক, দলীয় ও ব্যাক্তিগত স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা অর্জনের জন্য তাকিইয়া নীতি অনুসরণ করে চলে অর্থাৎ অন্তরে যা লুক্কায়িত রাখে লোক সম্মুখে তার বিপরীত প্রকাশ করে।

---

(২) শিয়াইজম ও কমিউনিজমের মধ্যে কতিপয় বেশ মজার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। (১) উভয় মতবাদের উদ্ভাবকই মূলতঃ ইহুদী। (২) উভয়েরই লক্ষ্য ধর্মবিশ্বাস বিশেষতঃ ইসলাম ধর্ম থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নেয়া। (৩) মানুষের যুগ-যুগান্তের লালিত সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও নৈতিক মূল্যবোধ ও কাঠামোকে ভেংগে চুরমার করে দেয়া। (৪) পূর্ববর্তী প্রজন্মের আদর্শ ও উত্তরাধিকারের প্রতি পরবর্তী প্রজন্মকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলা। (৫) জনগণকে মুষ্টিমেয় পুরোহিতগোষ্ঠী অথবা শাসকশ্রেণীর আজ্ঞাবহ গোলামে পরিণত করা।

শিয়া মযহাবে 'ইমামত'-এর স্থান

পৃথিবীর প্রচলিত ধর্ম ও মতবাদসমূহের ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, প্রত্যেক ধর্ম বা মতবাদেরই এমন কিছু মৌল বিশ্বাস বা আকীদা রয়েছে যেগুলিকে কেন্দ্র করে সে ধর্ম বা মতবাদটি গড়ে উঠেছে। যথাঃ-বর্তমান খৃষ্টবাদের ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্তবাদ, ইসলামের তৌহিদ, রিসালত ও আখিরাত, পুঁজিবাদের ব্যক্তিমালিকানা, সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় মালিকানা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে শিয়া মযহাবের মৌল বিশ্বাস হচ্ছে, 'ইমামত' আকীদা। বস্তুতঃ 'ইমামত' আকীদাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এবং দাঁড়িয়ে আছে শিয়াবাদ। ইমামত আকীদাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই তৈরী হয়েছে অন্যান্য আকীদা যেমন, কিতমান ও তাকিইয়া, কুরআনে বিকৃতি, শেষ ইমামের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্তর্ধান শায়খায়নের প্রতি বৈরিতা ইত্যাদি।

শিয়াবাদের ইমামতের সাথে অন্যান্য আকীদার সম্পর্ক বৃক্ষের কান্ডের সাথে শাখা-প্রশাখার সম্পর্কের মত অথবা পাত্রের তলার সঙ্গে পাত্রস্থিত পদার্থের সম্পর্কের মত। শিয়াবাদ ও ইমামত একে অপরের উপর নির্ভরশীল। তৌহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের ধারণা ছাড়া যেমন ইসলামের কথা কল্পনা করা যায় না, তেমনি ইমামত ছাড়া শিয়াবাদ হয় না। তাই দেখা যায় ইসলামে শিয়াবাদ ও ইমামত একই সময় একই ব্যক্তি কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে। আর এর পেছনে উদ্দেশ্যও ছিল একই। তা হল মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ইসলামের সর্বনাশ সাধন। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের গোড়ার দিকেই অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে ইসলামের দ্রুত বিস্তৃতি এবং মুসলমানদের অব্যাহত বিজয়ের যুগেই এমন একদল লোক কপটভাবে ইসলামে প্রবেশ করে বিশাল মুসলিম সমাজে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে, যাদের উদ্দেশ্যই ছিল সুযোগ পেলেই ইসলামের ক্ষতি সাধনে তৎপর হয়ে উঠা। প্রধানতঃ তারা এসেছিল তৎকালীন আরব উপদ্বীপের এখানে-সেখানে ছড়িয়ে থাকা ইহুদী সম্প্রদায় ও অগ্নি উপাসকদের মধ্য থেকে। এদের নেতৃত্বে ছিল ইয়ামনের জনৈক ইহুদী পন্ডিত আবদুল্লাহ ইবনে সাবা।

নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়েত অনুযায়ী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের শাসনামলে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। তার ইসলাম গ্রহণ ছিল প্রকৃতপক্ষে ইহুদীদের ইসলাম বিরোধিতার দ্বিতীয় পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে ইসলামের শত্রুরা সম্মিলিত সশস্ত্র সংগ্রামেও যখন ইসলামের ক্রমবর্ধমান বিজয়

অগ্রগতি ও শক্তিবৃদ্ধি রোধ করতে কোনমতেই সক্ষম হল না, তখন তারা বিশ্বাসঘাতকতামূলক ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও তার সহযোগীদের ইসলাম গ্রহণ ছিল এ ষড়যন্ত্রেরই অংশ। অবশ্য এটাই ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ষড়যন্ত্র ছিল না। তবে এ ষড়যন্ত্রই ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে সর্ববৃহৎ, সর্বব্যাপক ও সুদুরপ্রসারী চক্রান্ত। ইসলামে শিয়াবাদের উদ্ভব এ চক্রান্তেরই অবৈধ ফসল। এ চক্রান্তের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে, মুসলমানদের সান্নিধ্যে থেকে অভ্যন্তর হতে ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস সাধনে তৎপর হওয়া। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও তার সাথীরা ওসমান (রাঃ)–এর খিলাফতকালের গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে এ কাজটিই করেছিল এবং অত্যন্ত সফলভাবেই করেছিল।

কাজটি ছিল অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত। গোড়াতেই সে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান ও কর্মক্ষেত্র বেছে নেয়ায় আত্মনিয়োগ করে। এতদুপলক্ষে সে মক্কা, মদীনা, ইরাক, সিরিয়া, মিসর তথা তৎকালীন ইসলামী বিশ্ব ব্যাপকভাবে সফর করে।

শেষ পর্যন্ত মিসরকেই সে তার কাজের জন্য সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র হিসাবে দেখতে পেল। কারণ, ইসলামের মূল ভুখন্ড থেকে বেশ দূরে অবস্থিত হওয়ায় এবং ইসলাম সম্পর্কে মিসরের নবদীক্ষিত মুসলমানরা খুব পরিপক্ক না হওয়ায় অনায়াসে সে এখানে একদল সহযোগী ও অনুসারী খুঁজে নিতে সক্ষম হল। স্থান নির্বাচন করা এবং কতিপয় সাথী জুটিয়ে নেয়ার পরই সে গোপন প্রচারকার্যে নেমে গেল। কাজের সুবিধার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে সাবা তার প্রচারকার্যকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে নিল। সে সিদ্ধান্ত নিল যে, একটি পর্যায়ের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলেই কেবল সে পরবর্তী পর্যায়ে প্রবেশ করবে।

প্রথম পর্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নওমুসলিমদের মধ্যে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর অতিমানবতা ও অতীন্দ্রিয়তার দিকটি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলল যা কুরআন–সুন্নাহর শিক্ষার পরিপন্থী কিন্তু মর্মস্পর্শী। দ্বিতীয় পর্যায়ে সে হযরত আলীর ব্যক্তিত্ব, শক্তিমত্তা ও জনপ্রিয়তা এবং তাঁর সঙ্গে রসূলুল্লার আত্মীয়তা ও ঘনিষ্টতার সুযোগ নিয়ে তাঁর প্রতিও নানা অসাধারণত্ব ও অলৌকিকত্ব আরোপ করতে লাগল। এমন কি হযরত আলীকে শেষ পর্যন্ত নবী–রসূলদের পর্যায়ে পৌছিয়ে দিল। তৃতীয় পর্যায়ে সে প্রচার করতে লাগল যে প্রত্যেক নবীরই একজন ভারপ্রাপ্ত থাকেন যেমন হযরত হারুন (আঃ) ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)–এর ভারপ্রাপ্ত। এ উম্মতে রসূলুল্লাহর ভারপ্রাপ্ত

ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই, জামাতা ও সাথী হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ)। তাই রসূলুল্লাহর ওফাতের পর খলীফা, রাষ্ট্রপ্রধান ও ইমাম হবার অধিকার একমাত্র হযরত আলীর জন্যই নির্ধারিত ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তিকালের পর লোকেরা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে প্রথমে আবু বকর, পরে ওমর ও তারপর ওসমানকে খলীফা নিযুক্ত করেছে। অথচ এতে তাদের কোন হক ছিল না এবং শাসনকার্য পরিচালনায় তাদের যোগ্যতাও ছিল না। হযরত আলীর ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নিয়েই একাজ করা হয়েছে। সে আরো প্রচার করল যে, খলীফা ওসমান ও তাঁর গভর্ণরদের অন্যায়-অবিচার এবং অযোগ্য শাসনের ফলেই ইসলামী বিশ্বে এত অল্প সময়ের মধ্যেই গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এক পর্যায়ে মিসর ছাড়াও সিরিয়ায়ও সে তার প্রচারকার্য জোরদার করার প্রয়াস পায়। বলা বাহুল্য, ইবনে সাবার ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিই ছিল ওসমানের শাহাদত।

হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফত লাভের পর আবদুল্লাহ ইবনে সাবা তার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য আরো সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী ও সিরিয়ার গভর্ণর হযরত মুয়াবিয়ার মধ্যকার বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করে সে হযরত আলী (রাঃ)-এর অনুসারী ও সমর্থকদের মধ্যে তাঁর প্রতি অতিভক্তি, অস্বাভাবিক প্রেম-ভালবাসা ও অলৌকিক বিশ্বাসের কথাবার্তা ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। সে একথাও বলে বেড়াতে লাগল যে, পৃথিবীতে হযরত আলী হলেন আল্লাহর প্রতিভূ, তাঁর মধ্যে সমাসীন রয়েছে আল্লাহর রুহ। নবুওয়ত ও রিসালতের জন্য আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতপক্ষে হযরত আলীকে মনোনীত করেছিলেন। ওহী দিয়ে জিবরাইল (আঃ)-কে তাঁরই নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। ভুল বশতঃ তিনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট পৌছে গিয়েছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)! হযরত আলীর জীবদ্দশাতেই এবং তাঁর অজান্তে এসব অপপ্রচার গোপনে গোপনে দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ তাঁর অল্প শিক্ষিত ও স্বল্পবুদ্ধিমান সৈন্যদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য হযরত আলী যখন তা জানতে পারেন তখন এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। কিন্তু হযরত আলীর শাহাদতের পর কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনার পর কুফা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা শিয়া মতবাদ প্রচারের উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 'শিয়া' শব্দটির অর্থ হল সাহায্যকারী, সমর্থক, শিষ্য, অনুগামী, অনুসারী ইত্যাদি। শিয়ারা মনে করে থাকে যে, তারা হযরত আলী (রাঃ)-এর অনুসারী। কিন্তু আসলে কি তাই? সত্যিকার অর্থেই কি তারা তাঁর অনুসারী? যদি

তাই হত তবে কি তাদেরই একজন লোক হযরত আলীকে হত্যা করতে পারতো? কারবালার প্রান্তরে সাইয়েদেনা হুসাইন ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে অসহায় অবস্থায় শাহাদত বরণ করার জন্য ঠেলে দিয়ে দূর হতে তামাশা দেখতে পারতো? ইতিহাসের আলোকে বিচার করলে এ সত্য প্রকট হয়ে ধরা পড়ে যে, নবী পরিবার বা হযরত আলীর সাহায্য-সমর্থনের প্রতি শিয়া মযহাবের প্রবর্তকদের কোন আগ্রহই ছিল না। বরং তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিশুদ্ধ ইসলামকে জগত থেকে চিরতরে বিতাড়িত করা, রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর মহান সাহাবীদের পূত-পবিত্র চরিত্রকে কলংকিত করা এবং স্বয়ং হযরত আলী (রাঃ) ও তাঁর সত্যানুসারী বংশধরদের মনুষ্য স্তর থেকে উঠিয়ে গ্রীক দেবতাদের স্তরে নিয়ে যাওয়া। শিয়া উলামা ও গ্রন্থকাররা তাঁদের ইমামদের সম্পর্কে এমন সব ধারণা পোষণ করে থাকেন যা থেকে ঐ ইমামগণ নিজেদের মুক্ত বলে জানতেন। হযরত আলী মুর্তযার কানে একবার এ ধরনের প্রলাপোক্তির খবর পৌঁছলে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ডেকে এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করেছিলেন।

শিয়াবাদের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়ার পর এখানে আমরা শিয়াদের মূল আকীদা 'ইমামত' সম্পর্কে কিছু কথা পেশ করতে চাই। কিন্তু এর আগে বলে নেয়া ভাল যে, প্রথম দিকে শিয়ারা সামগ্রিকভাবে একটিমাত্র পথ ও মতের অনুসারী হলেও পরবর্তীকালে তা বহুসংখ্যক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিকদের মতে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত সত্তর ছাড়িয়ে যায়। (১) এগুলোর মধ্যে কোন কোন মযহাব আবার একাধিক উপ-মযহাবে বিভক্ত। অনেক মযহাব আবার এমনও রয়েছে যেগুলোর নাম ছাড়া বর্তমানে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বর্তমান বিশ্বের এখানে সেখানে যে সব মযহাবের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুসারী রয়েছে তন্মধ্যে অনুসারীদের সংখ্যা,রাজনৈতিক শক্তি, আন্তর্জাতিক মর্যাদা, ইত্যাদি দিক দিয়ে যে মযহাবটি সবচেয়ে গুরুত্ব ও পরিচিতির অধিকারী সেটি হল, 'শিয়া ইমামিয়া ইসনা আশারিয়া' বা দ্বাদশ ইমামপন্থী শিয়া মযহাব।

দ্বাদশ ইমামপন্থী শিয়ারা বারজন ইমামের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এঁদের মধ্যে ইমাম হলেন হযরত আলী (রাঃ)। শিয়াদের নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের রিওয়ায়েত অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায় হজ্জ থেকে ফিরার পথে 'গদীরে খুম' নামক স্থানে

---

(১) এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করা যেতে পারেঃ ইবনে জরীর তাবারী প্রণীত, তারিখুল উমাম ওয়াল মুলূক, ইবনে কাসীর দেমাশকীর 'আল-বিদয়াহ ওয়াল্ নেহায়া', ইবনে হাযম আন্দালুসী রচিত 'আল ফাসলু ফিল মিলাল ওয়াল নিহাল', শাহ আবদুল আযীম দেহলভীর 'আল-তুহফা আল-ইসনা আশারিয়া']।

আল্লাহর নির্দেশে অত্যন্ত পবিত্র ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে, রীতিমত আনুষ্ঠানিকভাবে পরবর্তী সময়ের জন্য হযরত আলী মুর্তযাকে স্বীয় খলীফা, প্রতিনিধি, মুসলমানদের ইমাম, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান–এক কথায় তাঁর উম্মতের সর্বময় কর্তা মনোনীত করার কথা ঘোষণা করেন। এরপর তিনি উপস্থিত সকল সাহাবীর,যাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর এবং ওমর ফারুকও ছিলেন, তাদের নিকট থেকে এ বিষয়ের উপর স্বীকারোক্তি ও অঙ্গীকার আদায় করেন। শিয়াদের আরো বিশ্বাস যে, এ ঘটনার আশিদিন পরই যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকাল করলেন, তখন আবু বকর, ওমর ও তাঁদের সমর্থক সাধারণ সাহাবীগণ ষড়যন্ত্র করে তাঁর মনোনয়নকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। শিয়াদের বিশ্বাস অনুযায়ী পরবর্তীকালে ইসলামী উম্মাহর উপর যত বালা মুসিবত ও বিপর্যয় নাযিল হয়েছে সব কিছুরই মূল কারণ ছিল রসূলুল্লাহর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা এবং হযরত আলীর অধিকার হরণ।

হযরত আলীর পর আল্লাহ তায়ালা ইমাম নিযুক্ত করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান (রাঃ)–কে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হযরত হুসাইন (রাঃ)–কে। অতপরঃ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ইমাম মনোনীত হন যথাক্রমে আলী ইবনে হুসাইন, জয়নুল আবেদীন, তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আলী বাকের, তাঁর পুত্র জাফর সাদেক, তাঁর পুত্র মূসা কাযেম, তাঁর পুত্র মূসা রেযা, তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আলী তকী, হাসান ইবনে আলী আসকারী এবং মুহাম্মদ ইবনে হাসান। তিনিই হলেন অন্তর্হিত ইমাম বা প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদী। এ পর্যন্ত এসেই ইমামত শেষ। তাঁর ইমামত কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। শিয়াদের বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি ২৫৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং পাঁচ বছর বয়সে অলৌকিকভাবে অদৃশ্য হয়ে যান ও সবার অলক্ষ্যে একটি গুহায় আত্মগোপন করে আছেন। কিয়ামতের পূর্বে কোনও এক সময় তিনি গুহা থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং পৃথিবীতে আহলে বাইতের প্রকৃত ইসলামী শাসন কায়েম করবেন।

শিয়াদের গ্রন্থাবলীতে 'ইমামত' প্রসঙ্গ

সম্মানিত পাঠকবর্গের জন্য আমরা এখানে দ্বাদশ ইমামপন্থী শিয়াদের নির্ভরযোগ্য, প্রামাণ্য ও সর্বজনমান্য হাদীস গ্রন্থসমূহ এবং এগুলোতে উদ্ধৃত নিষ্পাপ শিয়া ইমামদের পবিত্র বাণীর আলোকে ইমামত সম্পর্কে শিয়াদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক আকীদার কথা উল্লেখ করব।

সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রাচীন শিয়া হাদীসগ্রন্থ 'আল–জামিউল–কাফী'তে এসব বিষয় এমন বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে যে, এগুলোর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করলেও একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হয়ে যাবে। তাই আমরা এখানে গ্রন্থটির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের শুধু শিরোনামগুলোর অনুবাদ পরিবেশন করেই ক্ষান্ত হব। এসব অধ্যায়ে প্রধানতঃ শিয়া ইমামগণের পবিত্র হাদীস ও বাণীই নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের সমর্থনেই আনা হয়েছে একাধিক সহীহ রিওয়ায়েত। শিরোনামগুলের মধ্যে রয়েছেঃ

(১) ইমামগণ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নিযুক্ত ও মনোনীত হন (যেমন নবী–রসূলগণ আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত ও মনোনীত হয়ে থাকেন)। এক্ষেত্রে উম্মতের কিছু করণীয় নেই। এ কথার সমর্থনে অন্যান্যদের মধ্যে ইমাম আবুল হাসান মূসা কাযেমের রিওয়ায়েত আনা হয়েছে।

(২) ইমামগণকে চেনা ও মানা ঈমানের শর্ত (যেমন আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে জানা ও মানা ঈমানের শর্ত)। এ অধ্যায়ে ইমাম বাকের ও ইমাম জাফর সাদেকের রিওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে।

(৩) ইমাম ছাড়া সৃষ্টজীবের উপর আল্লাহর কর্তৃত্ব প্রমাণিত হয় না। এ অধ্যায়ে ইমাম জাফর সাদেকের বাণীসহ একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

(৪) বিশ্বব্রহ্মান্ড ইমাম ব্যতীত বিদ্যমান থাকতে পারে না। এ অধ্যায়ে অন্যান্যের মধ্যে ইমাম বাকেরের একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ ইমামের অস্তিত্ব ছাড়া এ পৃথিবী এক মুহূর্তের জন্যেও টিকে থাকতে পারে ন।

(৫) ইমাম আল্লাহ তায়ালার নূর। এ অধ্যায়ের প্রথম রিওয়ায়েতটিতেই কুরআন মজীদের আয়াত آمنوا بالله ورسله والنّور الذى أنزلنا

(তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহ, তার রসূলগণ ও সেই নূরের প্রতি যা আমরা নাযিল করেছি)–এর তফসীর প্রসঙ্গে ইমাম বাকের বলেন যে, এখানে নূর হল ইমামগণ। অথচ আহলে সুন্নাহর মতে নূর হচ্ছে এখানে 'আল–কুরআন'।

(৬) 'ইমামগণের আনুগত্য করা ফরয'। এ অধ্যায়ে বর্ণিত একাধিক হাদীসে ইমাম বাকের ও ইমাম জাফর সাদেকের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে যে, রসূলের আনুগত্যের মতই ইমামের আনুগত্যকরণ ফরয।

(৭) ইমামগণ নবীগণের মত মাসুম বা নিষ্পাপ। এ শিরোণামের অধীন একাধিক হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইমামগণ সর্বপ্রকার গুনাহ, দোষ-ত্রুটি, ভ্রান্তি, পদস্খলন ও অনবধানতা থেকে মুক্ত।

(৮) ইমামগণের মর্যাদা মুহম্মদ (সঃ)-এর সমান এবং অপর সকল নবীর উপরে। এ অধ্যায়ে আরো বর্ণিত হয়েছে ইমামতের মর্তবা সাধারণভাবে নবুয়তের মর্তবার উর্ধ্বে। আরো বলা হয়েছে যে, শিয়া ইমামগণের ইমামতে বিশ্বাসস্থাপনকারী ব্যক্তি যত বড় পাপিষ্ট, অত্যাচারী ও অসচ্চরিত্র হোক না কেন, এ বিশ্বাসের ফলে সে নাজাত পেয়ে যাবে।

(৯) ইমামগণ ভূত-ভবিষ্যত জানেন এবং কোন কিছুই তাদের অজানা নয়। ফেরেশতা, নবী ও রসূলগণকে প্রদত্ত সকল জ্ঞান ইমামদের জানা আছে। এ ছাড়া এমন অনেক কিছুই জানা রয়েছে যা নবীগণেরও জানা ছিল না।

(১০) পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণের উপর নাযিলকৃত সকল আসমানী কিতাব ইমামগণের নিকট রয়েছে এবং এগুলো মূল ভাষায় পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীতও তাঁদের নিকট পূর্ববর্তী নবীগণের নিদর্শনাবলী রয়েছে।

(১১) ইমামগণ হাশরের দিন শাফায়াতের অধিকারী হবেন।

(১২) 'ইমামগণ জ্ঞানের উৎস, নবুয়তের বৃক্ষ এবং ফেরেশতাদের অবতরণ স্থান'। ইমাম জাফর সাদেক থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, প্রতি শুক্রবার রাতে ইমামদের মে'রাজ হয়।

(১৩) ইমামগণ জানেন কখন তাঁরা মৃত্যুবরণ করবেন এবং মৃত্যু তাঁদের ইচ্ছাধীন।

(১৪) ইমামগণ দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক, যেখানে ইচ্ছা রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন।

(১৫) মানুষের নিকট কোন সত্য নেই। সত্য তা-ই যা ইমামদের নিকট থেকে এসেছে। আর যা ইমামদের নিকট থেকে আসেনি তা বাতিল।(১)

দ্বাদশ ইমামপন্থী শিয়া মযহাবের মৌলিক ও প্রাচীনতম গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়েতসমূহের ভিত্তিতে উপরে যা বলা হয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে একথা প্রমাণিত হয় যে, নবী-রসূলদের সকল বৈশিষ্ট্য ও জ্ঞান ইমামদের অর্জিত ছিল।

---

(১) দেখুন, আল-জামিউল কাফী পৃঃ ২২৫-৪০৭

আল্লাহর কতিপয় বিশিষ্ট গুণও ইমামগণকে প্রদান করা হয়েছিল। সমগ্র বিশ্বজগত ইমামদের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেয়া হয়েছে। তাঁরা গায়েব জানেন। তাঁরা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং গোটা সৃষ্টির উপর তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। এভাবে শিয়া উলামা ও গ্রন্থকারগণ তাঁদের ইমামদের, মানবতা ও নবুওয়তের দরজা থেকে উর্ধ্বে উঠিয়ে, উলুহিয়তের দরজায় পৌছিয়ে দিয়েছেন। অথচ স্বয়ং ইমামগণও নিজেদের সম্পর্কে কোনদিন এ ধরনের দাবী করেননি। অপরদিকে এ শিয়া আলেমরাই, আল্লাহ তাঁর প্রিয় রসূল মুহাম্মদ (সঃ)–এর নিকট ওহীর মাধ্যমে যেসব অদৃশ্য জ্ঞান নাযিল করেছেন, তা স্বীকার করেন। আসমান, জমীনের সৃষ্টির রহস্য, বেহেশত–দোজখের পরিচয় ও হাশর–নশরের ঘটনাবলী সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) মানব সমাজকে যেসব তথ্য দিয়েছেন সেগুলো তাঁরা ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চান।

কায়রোস্থ 'দারুল তাকরীব' তথা শিয়া–সুন্নী 'নৈকট্য প্রতিষ্ঠা কেন্দ্র' থেকে প্রকাশিত 'রিসালাতুল ইসলাম' নামক জার্ণালের চতুর্থ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় "শিয়া ইমামিয়া সম্প্রদায়ের কতিপয় গবেষণা" শীর্ষক একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। গবেষণামূলক এ নিবন্ধটির রচয়িতা হলেন বর্তমান শিয়া বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম, লেবাননের শিয়া শরীয়াহ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। তিনি তাঁর প্রবন্ধের একস্থানে প্রখ্যাত আধুনিক শিয়া মুজাহিদ শায়খ মুহাম্মদ হাসান আল–ইশতিবানী প্রণীত 'বাহ্রুল ফাওয়াহিদ' গ্রন্থের প্রথম খন্ড ২৬৭ পৃষ্ঠা থেকে একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃতিটি এরূপঃ "রসূল যখন শরীয়তের হুকুম–আহকাম যথা, অযু ভঙ্গের কারণ, হায়েয–নেফাসের মসলা, বিবাহ ও তালাকের নিয়ম ইত্যাকার বিষয়ে কোন ফয়সালা দেন তখন তা বিশ্বাস করা ও তদনুযায়ী আমল করা উম্মতের উপর ওয়াজেব হয়ে যায়। আর যদি তিনি অদৃশ্য বিষয়াবলী যেমন, আসমান ও জমীনের সৃষ্টি রহস্য, বেহেশতের হুরপরী ও প্রাসাদ সম্পর্কে কোন কিছু বলেন, তাহলে উম্মতের জন্য ওগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব নয়।'

এটা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, শিয়ারা তাদের শ্রদ্ধেয় ইমামগণের উপর অহেতুক মিথ্যার পাহাড় চাপিয়ে দিয়ে তাঁদের জন্য অদৃশ্য জ্ঞান দাবী করে এবং এর উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করে, যদিও এ জিনিসটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে সেই সব গায়েবী এলমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে তারা জরুরী মনে করে না যা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত। যেমন, আকাশ ও

ভূমন্ডলের সৃষ্টি, কিয়ামত ও পুনরুত্থান এবং বেহেশত–দোযখের বর্ণনা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ। অথচ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে

রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণিত কোনও একটি সহীহ হাদীসেও তিনি নিজের তরফ থেকে বানিয়ে কিছুই বলেননি। আল-কুরআন ঘোষণা করছেঃ "তিনি আপন ইচ্ছায় কিছুই বলেন না। এটা তো অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়।" (সূরা আন-নাজ্‌মঃ ৩, ৪)।

কেউ যদি শিয়া ইমামদের প্রতি আরোপিত অদৃশ্য জ্ঞান এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে সহীহভাবে প্রাপ্ত অদৃশ্য জ্ঞানের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেন তবে তিনি দেখতে পাবেন যে, কুরআন-হাদীসের মাধ্যমে রসূল (সঃ) থেকে প্রমাণিত অদৃশ্য জ্ঞানের পরিমাণ শিয়া আলেমগণ কর্তৃক তাঁদের বার ইমামের জন্য দাবীকৃত অদৃশ্য জ্ঞানের এক নগণ্য অংশও হবে না। অথচ আল্লাহ তায়ালা রসূল (সঃ)কে ওহীর মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করতেন এবং তাঁর ওফাতের পর ওহী অবতরণ নিশ্চিতভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। তদুপরি বার ইমাম থেকে এলমে গায়েব বর্ণনাকারী সবাই যে মিথ্যাচারী ছিলেন তা আহলে সুন্নাহর অন্তর্ভূক্ত হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শী-উলামাদের নিকট সুপ্রমাণিত। কিন্তু সাধারণ শিয়ারা যুক্তি-প্রমাণের কোন তোয়াক্কা না করেই অন্ধভাবে এক্ষেত্রে তাদের তথাকথিত উলামাদের মিথ্যাচারের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে যাচ্ছে। এদ্বারা যে আদৌ তাদের নির্দোষ ইমামদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হচ্ছে না বরং তাঁদেরকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে একথা তারা বুঝতেই চাচ্ছে না। জীবদ্দশায় কোন দিন তাদের ইমামগণ ওহী ও এলমে গায়েবের দাবী করেননি। শিয়া আলেমদের এটা অমার্জনীয় ধৃষ্টতা যে, তারা চায়, রিসালতে মুহাম্মদিয়ার দায়িত্ব কেবল অযু-গোসল ও স্ত্রীলোকের হায়েয-নেফাস সংক্রান্ত বিষয় এবং এ জাতীয় কিছু ফিকহী মসলা-মাসায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাক। ইসলাম ও এর রসূলের প্রতি একদিকে এ ধরনের অপমানজনক ও ধৃষ্টতাপূর্ণ অপপ্রচার এবং অপরদিকে মুখে মিলনের ললিতবাণী-কোনটির প্রতি আমরা সাড়া প্রদান করব? আধুনিক শিয়া প্রচার মাধ্যমগুলোর উম্মতে মুহাম্মদিয়ার শুকিয়ে যাওয়া পুরনো ঘা-কে নতুন করে ছিঁড়ে দেওয়া কি সত্যিই শিয়া-সুন্নী ঐক্যের আলামত না কি অন্য কিছু?

পুরনো চিন্তাধারাঃ নতুন প্রচার—কৌশল

আন্তরিকভাবেই হোক বা বিশেষ কোন কারণেই হোক শিয়া নেতৃবৃন্দ বর্তমানে সুন্নী-প্রধান দেশগুলোতে শিয়া-সুন্নী মিলনের কথা প্রচার-প্রসারের উপর খুব জোর দিচ্ছেন বলে মনে হয়। কিন্তু বাহ্যতঃ তাঁরা যতই উচ্চ কণ্ঠে শিয়া-সুন্নী ঐক্যের শ্লোগান দিয়ে যাননা কেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শিয়া আলেমদের গ্রন্থসমূহ পাঠ করলে একথাই মনে হয় যে, তাঁদের এসব শ্লোগানের উদ্দেশ্য আর যা-ই হোক ঐক্য নয়। এসব গ্রন্থ পাঠ করলে যে কোন নিরপেক্ষ পাঠকের অন্তরে এ প্রশ্ন উদিত না হয়ে পারেনা যে, এগুলোর আসল উদ্দেশ্য ইসলামের সর্বসম্মত ও সর্বজনস্বীকৃত মূলনীতিসমূহ থেকে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে নেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্যই শিয়া মযহাবের উদ্ভাবকরা ইসলামে 'ইমামত' আকীদার জন্ম দিয়েছেন যা তৌহিদ ও রিসালতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। 'ইমামতের' ধারণার সৃষ্টিই করা হয়েছে ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে মুসলমানদের অন্তরে সন্দেহের জন্ম দেয়ার জন্য। যেন এ সন্দেহ থেকে শূন্যতার উদ্ভব হয় এবং এ শূন্যতার উপর অনায়াসে অন্য যেকোন মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করা যায়।

বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি যে, কায়রোস্থ শিয়া-সুন্নী ঐক্য প্রতিষ্ঠা কেন্দ্রের সাবেক পরিচালক ও অর্থ বিষয়ক উপদেষ্টা, লোকদের এ ধারণা দিয়ে থাকেন যে, এসব আকীদা শিয়াদের মধ্যে আগেকার দিনে প্রচলিত ছিল-বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তিনি এ ধারণা দিয়ে থাকেন বিশেষতঃ সেইসব লোকদের, শিয়া ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে যাঁরা সম্যকরূপে অবহিত নন এবং যাঁদের এসব বিষয় বিস্তারিত অধ্যয়ন করারও সময় নেই। প্রকৃতপক্ষে এ ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণার নামান্তর। কেননা, যেসব বই-পুস্তক শিয়াদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পড়ানো হচ্ছে, তাতে এখনও এসব কথাই শিক্ষা দেয়া হয় এবং এগুলোকে শিয়া মযহাবের মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। তাছাড়া ইদানীংকালে শিয়া উলামা ও নেতৃবৃন্দ যেসব ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ করেছেন সেগুলো পূর্বেকার পুস্তকাদি থেকেও অধিক ক্ষতিকর এবং শিয়া-সুন্নী মিলনের ধারণার অধিক প্রতিকূল।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা এখানে শিয়াদের জনৈক আলেমের কথা উল্লেখ করতে পারি, যিনি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত ঘোষণা করে থাকেন যে, শিয়া-সুন্নী মিলনের দিকে তিনি একজন একনিষ্ঠ আহ্বায়ক। তিনি হচ্ছেন শায়খ মুহাম্মদ বিন

মাহদী আল–খালেসী। মিসর ও অন্যান্য দেশে তাঁর এমন অনেক বন্ধু–বান্ধব রয়েছেন যাঁরা শিয়া–সুন্নী ঐক্যের প্রতি সর্বদা আহবান জানাচ্ছেন এবং এ উদ্দেশে আহলে সুন্নতের মাঝে ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এইযে, ঐক্য ও সমঝোতার প্রতি আহবানকারী এ ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (সঃ) ঘনিষ্ঠতম দুই সাহাবী, ইসলামের প্রথম দুই খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারুককে মুমিন বলে স্বীকার করতেও নারাজ। এ প্রসংগে তাঁর "ইহ্‌য়াউশ্ শরীয়াহ্ ফী মাযহাবিশ শিয়াহ" গ্রন্থের প্রথম খন্ড ৬৩–৬৪ পৃষ্ঠা থেকে এখানে একটি উদ্ধৃতি পেশ করা যায়। উদ্ধৃতিটিতে তিনি সূরা 'ফাতহ'–এর ১৮ নম্বর আয়াতের উপর মন্তব্য করেছেন। আয়াতটিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের তলায় তোমার নিকট বায়আত করছিল'।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবু বকর ও ওমরের প্রসংগ টেনে এনে শায়খ মুহাম্মদ বিন মাহ্‌দী বলেন, ''আর যদি তারা অর্থাৎ আহলে সুন্নাহ বলে যে, আবু বকর ও ওমর বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সেই সব সাহাবীর অন্তর্ভূক্ত যাদের উপর কুরআনে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কথা বলা হয়েছে, তবে আমরা এর উত্তরে বলবোঃ আল্লাহ বলতেন যে, 'তিনি গাছের তলায় বায়আতকারীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন' অথবা, 'তোমার হাতে বায়আতকারীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন' তাহলে উক্ত আয়াত দ্বারা বায়আতকারী সকলের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রমাণিত হত। কিন্ত আল্লাহ যখন বলেছেন, তিনি বায়আতকারী মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তখন আয়াতের দ্বারা একমাত্র খালেস মুমিনদের উপরই আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রমাণিত হয়। আবু বকর ও ওমর নিজেদের ঈমান খালেস করেননি, তাই তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টির মধ্যে শামিল হননি।''

ইতিপূর্বে নজফী আলেমগণ কর্তৃক সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত 'আয–যাহরা' গ্রন্থে ইসলামের প্রথম তিন খলীফা ও অন্যান্য সাহাবী সম্পর্কে আধুনিক শিয়া পন্ডিতদের মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। এসব শিয়া আলেম আমাদের সমসাময়িক যুগের এবং দাবী করে থাকেন যে, ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ সাধন ও রক্ষার ব্যাপারে তারা পরম উৎসাহী ও একান্ত আগ্রহী। কিন্তু এই যদি হয় হযরত আবু বকর সিদ্দীক, ওমর ফারুক ও রসূলুল্লাহর (সঃ) প্রিয় সাহাবীগণ সম্পর্কে তাঁদের আকীদা, তবে শিয়া–সুন্নী ঐক্যের ক্ষেত্রে তাঁদের আন্তরিকতার উপর আমরা কী করে আস্থা স্থাপন করতে পারি? কী করেই বা আশা করতে পারি যে, সত্যিই তাঁরা ঐক্য ও সমঝোতার স্থপতি? তবে কি তারা সকলেই মুসলিম দূর্গে 'পঞ্চম বাহিনীর প্রেতাত্মা' শিয়াদের ইতিহাস পাঠ করলে মনে হয় অনেকটা তা–ই। মুসলমানদের বুকে আশ্রয় নিয়ে ইসলামের পাঁজর ভেংগে দেয়াই যেন তাদের কাজ। তবে এ কাজটি তারা প্রকাশ্যে করেনা, অত্যন্ত গোপনে ও সুপরিকল্পিতভাবে তারা এ পথে পা বাড়ায়।

শিয়াদের দ্বিমুখী নীতি

ইতিহাসের সর্বস্তরে ইসলামী সরকারসমূহের প্রতি শিয়া জনগণ ও নেতৃবৃন্দের যে দৃষ্টিভংগী পরিলক্ষিত হয়েছে তা এইযে, যখনই কোন ইসলামী সরকার শক্তিশালী ও মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখনই তারা রাষ্ট্রীয় সুযোগ–সুবিধা অর্জন ও ক্ষমতার ভাগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তার কপট আনুগত্য ও চাটুবৃত্তি শুরু করেছে। আর যখনই সেই সরকার দুর্বল হয়ে পড়েছে অথবা কোন পরাক্রমশালী শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে তখনই শিয়ারা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুর সংগে হাত মিলিয়েছে। উমাইয়া শাসনের শেষের দিকে এমনটিই ঘটেছিল। বলা যায়, শেষ দিকের দুর্বল উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে তাঁদের চাচাত ভাই আব্বাসীয়দের বিদ্রোহ ছিল শিয়াদেরই উসকানি, উত্তেজনা ও ষড়যন্ত্রের ফল।

পরবর্তীকালে আব্বাসীয় খিলাফতের দুর্বলতার সময়ও অনুরূপ অপরাধমুলক ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্বর হালাকু খানের নেতৃত্বে মোংগল পৌত্তলিকগণ কর্তৃক মুসলিম সভ্যতা–সংস্কৃতির রাজধানী এবং ইসলামী জ্ঞান–বিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি বাগদাদ আক্রান্ত হয়ে আব্বাসীয় তথা ইসলামী খিলাফত যখন হুমকির সম্মুখীন হয় তখনও শিয়ারা ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের সাথে সহযোগিতা করে। সে সময়ে শিয়াদের প্রখ্যাত ধর্মীয় পণ্ডিত ও রাজনৈতিক নেতা আল্লামা নাসিরুদ্দিন তুসী সরলমতি, দুর্বল ও বিলাসী আব্বাসীয় খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহর সুনজরে পড়ার উদ্দেশ্যে প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনার কিছুদিন পরই তিনি অকস্মাৎ আপন মনোভাব বদলে ফেলেন এবং স্বপক্ষ ত্যাগ করে বোধগম্য কারণেই মুসলমাদের চরম শত্রু তাতার হালাকু খানের সংগে যোগ দেন। হালাকু খানও সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে তাঁকে আপন প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। হালাকুর রাজসভায় অন্যান্য শিয়া নেতৃবৃন্দও গুরুত্বপূর্ণ আসন লাভ করেন। তুসীকে পেয়েই হালাকু খান বুঝতে পেরেছিলেন যে, এর দ্বারাই মুসলমানদের সর্বনাশ সাধন সম্ভব। পরবর্তীতে হয়েছিলও তাই। বিশেষতঃ এজন্য যে, বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফার দরবারেও তখন ছিল শিয়াদের প্রাধান্য। সেখান থেকেও শিয়া নেতৃবৃন্দ গোপনে তখন ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

খলীফার দরবার থেকে গোপন সংবাদ পেয়েই নাসিরুদ্দিন তুসী ৬৫৫ হিজরীতে হালাকু খানকে বাগদাদ আক্রমণ করার পরামর্শ দেন। এভাবে তিনি ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিপদ ত্বরান্বিত করার জন্য একজন অমুসলিম শাসককে সক্রিয় সহায়তা দান করেন। এমনকি তিনি বাগদাদ আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞের নায়ক হালাকু খানের বিজয়ী শোভাযাত্রার অগ্রভাগে থেকে তার সংগে মুসলিম নর–নারী ও শিশু–বৃদ্ধের ব্যাপক হত্যাকান্ডের তদারকী করেন এবং ইসলামী জ্ঞান–বিজ্ঞানের লক্ষ লক্ষ গ্রন্থসহ শত শত পাঠাগার দজলা নদীর গর্ভে নিমজ্জিত করার দৃশ্য উপভোগ করেন। ঐতিহাসিক এ গণহত্যায় ১৬ লক্ষ মতান্তরে কমপক্ষে ১ কোটি মুসলমানদের হত্যা করা হয়।

মধ্যযুগে এতবড় গণহত্যা ও সংস্কৃতি–নিধনযজ্ঞ বিশ্বের আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয়নি। এমন হয়েছিল যে, বিপুল পরিমাণ হস্তলিখিত গ্রন্থাবলীর কালিতে দজলা নদীর পানি বহু দিন পর্যন্ত কালো রং ধারণ করে প্রবাহিত হয়। বাগদাদের এ নজীরবিহীন সাংস্কৃতিক নিধন–যজ্ঞের ফলে কুরআন, হাদীস, তফসীর,ফিক্‌হ এবং ইসলামী শরীয়তের অন্যান্য জ্ঞান–বিজ্ঞান ছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস, সাহিত্য, কবিতা, ভাষাবিজ্ঞান ও প্রাচীন জ্ঞান–বিজ্ঞানের অনেক মূল্যবান সম্পদ চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, শুধু মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য নয় বরং গোটা মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংসলীলা একটি অপুরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে। অথচ এজন্য মুলতঃ মুসলমান নামধারী কিছু সংখ্যক লোকই দায়ী।

শিয়া ধর্মগুরু নাসিরুদ্দীন তুসীর সাথে তাঁর দ'জন বিশ্বস্ত সহকর্মীও অমানুষিক বিশ্বাসঘাতকতার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তন্মধ্যে একজন হলেন খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহর শিয়া ওজীর মুহাম্মদ বিন আহমদ আল–আলকামী এবং অপরজন হলেন ইবনে আলকামীর ঘনিষ্ট বন্ধু সুন্নী বিদ্বেষী মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের জনৈক গ্রন্থকার আবদুল হামিদ বিন আবুল হাদীদ। শেষোক্ত ব্যক্তিটি সারাজীবনই রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সাহাবীদের শত্রুতায় লিপ্ত ছিলেন। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর গ্রন্থ 'শরহে নাহজুল বালাগাত' যা তিনি এমন সব মিথ্যা তথ্যাবলীর দ্বারা পরিপূর্ণ করে রেখে গেছেন যা আজো ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করে তুলে ধরেছে। ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা এখনো এ ধরনের গ্রন্থ দ্বারা প্রতারিত হয়ে থাকেন। এমনকি আমাদের শিক্ষিত সমাজও এ থেকে মুক্ত নন। অপরদিকে ইবনে আলকামী, যাঁকে বিশ্বাসঘাতক জেনেও সংশোধনের সুযোগ দেয়ার জন্য দয়াপরবশ

হয়ে খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ আপন ওজীর নিযুক্ত করেছিলেন, অনুগ্রহের প্রতিদান কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে না দিয়ে–দিয়েছিলেন বিশ্বাসঘাতকতা ও শত্রুতার মাধ্যমে। আসলে তিনিই নাসিরুদ্দীন তুসীর মাধ্যমে হালাকু খানকে বাগদাদ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে শিয়ারা এখনও হালাকুর সেই বাগদাদ ধ্বংসযজ্ঞের কথা স্মরণ করে আনন্দ উপভোগ করে থাকে। কারো কৌতূহল হলে তিনি একথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য শিয়া গ্রন্থকারগণ রচিত নাসিরুদ্দীন তুসীর যেকোন একটি জীবনচরিত পাঠ করে দেখতে পারেন। তন্মধ্যে সর্বশেষ গ্রন্থটি হল আল্লামা খোনসারী প্রণীত 'রওযাতুল জান্নাত'–যা হত্যাযজ্ঞের নায়ক ও বিশ্বাসঘাতকদের প্রশংসায় পরিপূর্ণ। এতে আরও দেখতে পাবেন, ইসলামের সেই মহাবিপর্যয়ে তাদের তৃপ্তির নগ্ন প্রকাশ, ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম ধ্বংসলীলার কর্মকান্ডে তাদের প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থতা এবং মুসলিম নর–নারী, শিশু–বৃদ্ধের ব্যাপক হত্যাযজ্ঞে তাদের আনন্দ–উল্লাসের বিস্তারিত বিবরণ। নিষ্ঠুরতম শত্রু এবং কঠোরপ্রাণ পাষন্ডও কি এধরনের হৃদয়বিদারক ঘটনায় আনন্দ প্রকাশে লজ্জাবোধ না করে পারে? কট্টর নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তিও কি শিয়াদের অনুরূপ নির্দয় আচরণকে তাদের তথাকথিত শিয়া–সুন্নী ঐক্যের শ্লোগানের সাথে সংগতিপূর্ণ বলে ভাবতে পারেন? তবে কি এ শ্লোগান নতুন কোন ষড়যন্ত্রের ইংগিত বহন করে?

মৌলিক বিষয়েও শিয়া–সুন্নী বিরোধ বিদ্যমান

ইদানিং সুন্নী দেশসমূহে যেসব শিয়া প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি শিয়া–সুন্নী ঐক্যের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরা যে বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে তুলে ধরছেন তা এইযে, শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে বিদ্যমান মতবিরোধ গুলো কোন মৌলিক বিষয় নিয়ে নয় বরং ছোটখাট বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাঁরা মানুষকে এ ধারণা দিতে চান যে, হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মযহাব সমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন প্রচুর মত পার্থক্য রয়েছে, শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যকার মতভেদগুলো অনেকটা সেই জাতীয়। কাজেই অন্যান্য মযহাবের অনুসারীদের মধ্যে যেমন ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব, তেমনি শিয়া–সুন্নী ঐক্যও কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু ব্যাপারটা কি আসলে তাই? শিয়াদের ধর্মীয় গ্রন্থ–সমূহেই আমরা এর জবাব খুঁজে পেতে পারি।

শিয়াদের বিশিষ্ট জীবনীকার আল্লামা খোনসারী তাঁর 'রওযাতুল জান্নাত' গ্রন্থে (২য় সংস্করণ, তেহরান ১৩৬৭ হিঃ, পৃঃ ৫৭৯) শায়খ নাসিরুদ্দীন তুসীর জীবনী লিখতে গিয়ে তাঁর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। নাসিরুদ্দীন তুসীর মন্তব্যটি উদ্ধৃত করার আগে এটিকে খোনসারী একটি প্রকৃত সত্য, মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন উক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। নাসিরুদ্দীন তাঁর এ উক্তিতে তিহাত্তরটি ফেরকার মধ্যে ইমামিয়া ফেরকাকে আল্লাহর নিকট একমাত্র নাজাতপ্রাপ্ত ফেরকা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর উক্তিটি দেখুনঃ

„ انى اعتبرت جميع المذاهب ووقفت على أصولها وفروعها
فوجدت من عدا الامامية مشتركة فى الاصول المعتبرة فى الايمان
وان اختلفوا فى أشياء يتساوى اثباتها ونفيها بالنسبة الى الايمان
ثم وجدت ان الطائفة الامامية يخالفون الكل فى أصولهم، فلو
كانت فرقة ممن عداهم ناجية لكان الكل ناجين، فدل على أن
الناجى هو الامامية لا غير"

"আমি সকল মযহাব বিচার–বিশ্লেষণ করে দেখেছি এবং এগুলোর মূল ও শাখা–প্রশাখা সম্পর্কে চিন্তা করেছি। অবশেষে দেখতে পেয়েছি, ইমামিয়া দল ব্যতীত অন্য সব দল ঈমানের মৌলিক বিষয় সমূহে একমত, যদিও তাদের মধ্যে এমন অনেক বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে যেগুলো স্বীকার করা ও অস্বীকার করা ঈমানের ক্ষেত্রে সমান। আরও দেখতে পেয়েছি ইমামিয়া সম্প্রদায় মৌলিক বিষয়ে সকলের সংগে ভিন্নমত পোষণকারী। অতএব একথা বলা যায় যে, ইমামিয়া ব্যতীত অন্য যে কোন একটি দলের মুক্তি লাভ সকলের মুক্তিলাভেরই নামান্তর এক্ষণে প্রমাণিত হল যে, ইমামিয়া ব্যতীত অন্য যে কোন দলের মুক্তি লাভ সকলের মুক্তি–লাভেরই নামান্তর। নাজাত লাভকারী দল কেবল এই ইমামিয়া দলই। অন্য কোন দল নয়।"

শিয়া জীবনীকার খোনসারী তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থে এ প্রসংগে অন্য একজন প্রখ্যাত শিয়া গ্রন্থকার সাইয়েদ নেয়ামত উল্লাহ মুসাভীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। মুসাভী বলেন, "সকল মযহাবের অনুসারীরা এ ব্যাপারে একমত যে, একমাত্র উভয় শাহাদতই নাজাতের চাবিকাঠি। এক্ষেত্রে তাদের দলীল রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর হাদীসটি

من قال لا اله الا الله دخل الجنة -

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি বলবে,' আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই" সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে"। পক্ষান্তরে ইমামিয়া মযহাবের সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, দ্বাদশ ইমাম পর্যন্ত সকল আহলে বাইতের সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার এবং তাঁদের শত্রুদের (আবু বকর ও ওমরসহ সকল সুন্নী শাসক ও নেতৃবৃন্দ) সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ব্যতীত নাজাতের অন্য কোন উপায় নেই। সুতরাং মৌলিক এ আকীদার ক্ষেত্রেও, যার উপর নাজাত নির্ভরশীল, ইমামিয়া দল অন্য সকল দলের বিপরীত মত পোষণ করে।"

উপরোল্লিখিত দু'টি উদ্ধৃতি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে যে, আল্লামা তুসী মুসাভী ও খোনসারী একদিকে যেমন সত্য কথা বলেছেন, অপরদিকে তেমন মিথ্যাও বলেছেন। তাঁদের কথার মধ্যে যেটুকু সত্য সেটুকু হল, "মুসলমানদের বিভিন্ন ফেরকা মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রে পরস্পর কাছাকাছি, তাদের মত বিরোধ শুধু আনুষংগিক বিষয়সমূহে। ফলে মৌলিক নীতিমালার প্রশ্নে কাছাকাছি অবস্থানকারী দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা ও নৈকট্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব।" কিন্তু শিয়া ইমামিয়া মযহাবের সংগে অন্য কোন মযহাবের ঐক্য সম্ভব নয়। কেননা, তারা সকল মুসলমানের সংগে আকীদা ও মূলনীতির ক্ষেত্রে

বিরোধিতা করে। মুসলমানদের উপর তারা কেবল তখনই সন্তুষ্ট হবে যখন মুসলমানরা (তাদের ভাষায়) জিবত–তাগুত তথা হযরত আবু বকর ও ওমর ফারুক এবং তাঁদের সমর্থক ও অনুসারীদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করবে এবং তাঁদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে। শুধু তাই নয়, বরং তারা চায় যে, আমরা সম্পর্কচ্ছেদ করি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা (রাঃ) এবং হযরত ফাতেমা ছাড়া তাঁর অপর তিন কন্যা আর তাঁদের স্বামীদের সংগেও যাদের একজন ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ)। এ ছাড়াও সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে হযরত যায়েদ বিন আলী বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবু তালেব এবং আহলে বাইতের সেইসব সদস্যদের সাথে যাঁরা প্রকাশ্যে শিয়াদের কার্যকলাপ ও ভ্রান্ত আকীদার সমালোচনা করেন।

কার্যতঃ শিয়ারা তাদের সাথে ঐক্য সমঝোতা স্থাপনের জন্য আমাদের উপর দু'টি শর্ত আরোপ করে। প্রথমটি হল, আমরা যেন তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর প্রিয় সাহাবীদের উপর লা'নত করি (নাউযুবিল্লাহ) দ্বিতীয়টি হল, তাদের মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী নন এমন সকলের সাথে যেন আমরা সম্পর্কচ্ছেদ করি। তাছাড়াও আমরা যেন আল–কুরআনের বিকৃতিসহ এমন কিছু বিশ্বাসে তাদের সংগে শরীক হই যেগুলোর বর্ণনা উপরে উল্লেখিত হয়েছে। এক পক্ষ যদি তার সকল বাড়াবাড়ি, একগুঁয়েমী ও অন্যায় সমর অব্যাহত রেখে অপর পক্ষকে সন্ধির জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকে তবে কি অপর পক্ষ এ ডাকে সাড়া দিতে পারে?

আর যে কথাটি তারা মিথ্যা বলেছে তা হল, তাদের এ দাবী যে, শিয়া ব্যতীত অন্য সকল মুসলমানের নিকট শাহাদাতদ্বয়ের মৌখিক স্বীকৃতি পরকালে নাজাতের চাবিকাঠি। শিয়া নেতৃবৃন্দের এ দাবীর মধ্যে সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতার গন্ধও নেই। এসব কথা দ্বারা সরলমনা সাধারণ শিয়া জনগণকে ধোকা দেয়াই তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁদের ভাল করেই জানা রয়েছে যে, শাহাদতদ্বয়ের মৌখিক স্বীকৃতি কোন ব্যক্তির ইসলামে প্রবেশের প্রাথমিক শর্ত মাত্র। এ কলেমার উচ্চারণকারী ব্যক্তি শত্রুপক্ষের হলেও পার্থিব জগতে মুসলমানদের হাত থেকে তার জানমাল নিরাপদ হয়ে যাবে। আর পরকালের নাজাত নির্ভর করবে তার প্রকৃত ঈমানের উপর। আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আবদুল আযীযের ভাষায় "ঈমান হল কতিপয় কর্তব্য ও দায়িত্ব, বিধি–নিষেধ, আইন–কানুন ও রীতিনীতির সমষ্টি। যে ব্যক্তি এগুলো মেনে চলবে তার ঈমান পূর্ণ হবে আর যে মেনে চলবেনা তার ঈমান পূর্ণতা প্রাপ্ত হবেনা।"

বস্তুত, আহলে সুন্নাহর নিকট ঈমানের পূর্ণ সংজ্ঞা হল, অন্তরে কতিপয় আকীদা

পোষণ করা, মুখে এগুলোর প্রতি স্বীকৃতি ঘোষণা এবং জীবনের দৈনন্দিন কর্মকান্ডে এসব আকীদার বাস্তবায়ন ঘটানো। উদাহরণ স্বরূপ আকীদা গুলো হল, তৌহীদ, তকদীরের ভালমন্দ, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং তদনুযায়ী জিন্দেগী পরিচালনা করা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বিধি–নিষেধ ও আদর্শকে মেনে চলা।

কিন্তু শিয়াদের তথাকথিত দ্বাদশতম ইমামের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন কোনক্রমেই ঈমানের উক্ত সর্বসম্মত বিষয় গুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্বাদশতম ইমাম আসলে একজন কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব, বাস্তবে কোনদিনই তার কোন অস্তিত্ব ছিলনা এবং এখনও নেই। শিয়া ধর্মগ্রন্থ সমুহে এ দ্বাদশতম ইমাম সম্পর্কে যত সব আজগুবি, অস্বাভাবিক ও অলৌকিক রিওয়ায়েত রয়েছে সবই সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারদের উর্বর মস্তিষ্কের অবাস্তব কল্পনার ফসল। কেননা, শিয়াদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ আল–জামিউল কাফীর বর্ণনা অনুযায়ী একাদশতম ইমাম হাসান আসকারী ইবনে আলী ২৬০ হিজরীতে আটাশ বছর বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন। এ তথ্য তাঁর সহোদর ভাই জাফর ইবনে আলী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যের নিকট থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া এবং ইসলামের ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত। তৎকালীন সরকারী অনুসন্ধান এবং তদন্ত থেকেও একথা প্রমাণিত হয়। ফলে সরকারী তত্ত্বাবধানেই ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাঁর ধন–সম্পত্তি তাঁর ভ্রাতা ও অন্য ওয়ারিসদের মধ্যে যথারীতি বন্টন করে দেয়া হয়।

তাছাড়া অন্য একটি শক্তিশালী সূত্র থেকেও প্রমাণিত হয় যে, একাদশতম ইমামের কোন বংশধর ছিলনা। আলাভী পরিবারের সন্তানদের একটি জন্মতালিকা রয়েছে, যা তখনকার দিনে একজন নকীবের নিকট সংরক্ষিত থাকত। যখনই তাঁদের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করতো, তিনি তা তালিকাভুক্ত করে নিতেন। দেখা যায়, উক্ত তালিকায় হাসান আসকারীর কোন সন্তান–সন্ততির নাম রেজিষ্টি করা হয়নি এবং হাসান আসকারী সমসাময়িক আলাভীদের কারো নিকট এমন কোন তথ্য নেই যে, তিনি কোন পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। এটাই বাস্তব ঘটনা ও ইতিহাসের সাক্ষ্য।

কিন্তু এ ঐতিহাসিক বাস্তবতার উপরই জন্ম নিয়েছে পৌরানিক উপাখ্যান। হযরত হাসান আসকারী নিঃসন্তান মৃত্যুবরণ করে শিয়া ইমামিয়া সম্প্রদায়ের জন্য যে সংকট সৃষ্টি করে গেলেন সে সংসটোত্তরণের জন্যই নিপুণ শিয়া গ্রন্থকাররা রচনা করলেন একের পর এক মিথ্যা কাহিনী, কল্পিত উপাখ্যান ও অলৌকিক কল্পকথা। অবশ্য সৃষ্ট এ সংকটের জন্য দায়ী ছিলেন তারাই। কারণ তাঁরাই তাঁদের বানানো, মনগড়া

রিওয়ায়েত সমূহ দ্বারা ইতিপূর্বে এ নীতি প্রতিষ্ঠিত করেন যে, ইমামের পুত্র ছাড়া অন্য কেউ ইমাম হতে পারেনা। কন্যা সন্তানতো নয়ই–ইমামের কোন জীবিত ভাইও নয়। তাই তাঁরা যখন উপলব্ধি করলেন যে, হাসান আসকারীর মৃত্যুতে ইমামতের ধারা বন্ধ হয়ে গেল, ইমামিয়া মযহাবের অপমৃত্যু ঘটল এবং তাঁরা আর ইমামপন্থী থাকলনা, তখন মুহাম্মদ বিন নুসাইর নামক বনী নুসাইর গোত্রের আশ্রিত তাদেরই জনৈক শয়তান এক মতবাদ আবিষ্কার করে বসল। সে প্রচার করে দিল যে, হাসান আসকারীর এক ছেলে তার পিতার গৃহের ভূগর্ভস্থ কক্ষে লুক্কায়িত রয়েছে। এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী হাসান আসকারীর মৃত্যুর চার বছর পূর্বে তাঁর জনৈকা বাঁদীর গর্ভে কথিত এ সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। যাঁকে সযত্নে সাধারণের নজর থেকে গোপন রাখা হয়, যেন কেউ তাঁকে দেখতে না পায়।

শিয়ারা আরো বিশ্বাস করে যে, হাসান আসকারীর মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পূর্বে মাত্র চার বছর বয়সে তাঁর এ পুত্র ইমামগণের নিকট রক্ষিত সকল অলৌকিক জিনিষ ও প্রাচীন নিদর্শন, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ, হযরত আলীর সংকলিত আসল কুরআন, পূর্ববর্তী নবী–রসূলদের মু'জেযা ইত্যাদিসহ সবার অলক্ষ্যে অন্তর্হিত হয়ে যান এবং ইরাকের 'সামাররা' নামক শহরের একটি গুহায় আত্মগোপন করেন। শিয়াদের আকীদা অনুযায়ী তিনিই সর্বশেষ ইমাম। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মানব সমাজে আত্মপ্রকাশ করবেন না। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে কিয়ামতের পূর্বে তিনি গুহা থেকে বের হয়ে আসবেন এবং পৃথিবীতে আবার আহলে বাইতের শাসন কায়েম করবেন।

অন্তর্হিত ইমাম সম্পর্কে এটাও শিয়া মযহাবের একটি মৌলিক বিশ্বাস যে, পিতৃগৃহের ভূগর্ভস্থ কক্ষ থেকে গোপনে অজ্ঞাত গুহায় স্থানান্তরিত হবার পরও কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁর সংগে কতিপয় বিশ্বস্ত দূতের যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। এসব দূতের মাধ্যমে তাঁর নিকট ভক্তদের চিঠিপত্র এবং আবেদন–নিবেদনও পৌঁছত, ভক্তরা এগুলোর জবাবও পেত। শিয়া গ্রন্থকাররা এ কয়েক বছরের সময়কালকে 'গায়বতে সুগরা' (ছোট অন্তর্ধান) বলে অভিহিত করেছেন। অতঃপর আত্মগোপনকারী ইমামের সাথে দূতদের কোন যোগাযোগ থাকেনা এবং এর সম্ভাবনাও শেষ হয়ে যায়। শিয়াদের বিশ্বাস যে, যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেলেও বর্তমানেও তিনি গুহায় আত্মগোপন করে আছেন এবং কিয়ামতের আগে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন। পুনর্বার আবির্ভূত হবার পূর্ব পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়কালকে শিয়া গ্রন্থসমূহে 'গায়বতে কুবরা' (মহা অন্তর্ধান) বলা হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন করা যায়, এ অযৌক্তিক মতবাদ, এতসব অবাস্তব গল্প–কাহিনী এবং মিথ্যার প্রাসাদ তৈরী করার শিয়া গ্রন্থকারদের কী প্রয়োজনটা পড়েছিল? আসলে খুব ঠেকায় পড়ে বাধ্য হয়েই তাঁদের এসব মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে হয়েছে। আর সে ঠেকা হল অন্য একটি ভিত্তিহীন মতবাদকে সমর্থন দেয়া। ইতিপূর্বে তাঁরা শিয়া জনগণকে বুঝিয়েছিল যে, উম্মত ও সৃষ্টির জন্য ইমামের অস্তিত্ব অপরিহার্য। ইমামের অস্তিত্ব ছাড়া এ সৃষ্টি এক মুহূর্তও টিকে থাকতে পারেনা। অতঃপর যখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে একাদশতম ইমাম হাসান আসকারী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করলেন, তখন তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ইমামিয়া মযহাবের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই নতুন মিথ্যার দেয়াল নির্মাণ করলেন। কিন্তু তাঁদের দুর্ভাগ্য যে, ইমাম হাসান আসকারীর বেরসিক ভাই জাফর ইবনে আলী এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা আসল সত্য প্রকাশ করে দিয়ে মিথ্যার এ দেয়ালকে ভেংগে চুরমার করে দিলেন। শিয়া ইমামিয়াদের এটি সত্যিই একটি বড় দুর্ভাগ্য।

এরপরও শিয়ারা চায় যে, মুসলমানরা তাদের এসব মিথ্যা ভাষণে বিশ্বাস স্থাপন করুক। তাদের সাথে ঐক্য ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলমানরা ইসলামে যা কিছু মহৎ,গৌরবময় ও শ্রদ্ধেয় সবকিছু পরিত্যাগ করে,তাদের বিদআতী মতবাদ এবং প্রাচীন গ্রীক উপকথার চেয়েও আজগুবি সব গল্প–কাহিনীতে বিশ্বাস স্থাপন করুক। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব মানসিক চিকিৎসার হাসপাতালে পরিণত হলেই কেবল তাদের এ দূরাশা পূরণ হতে পারে। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে বিবেকের নেয়ামত দান করেছেন। ঈমানের পর এটাই আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম দান। আমাদের উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে,তিনি আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দিয়েছেন, কিয়ামতের দিন নাজাত লাভকারী আহলে সুন্নাহ ওয়াল জমায়াতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি শিয়াদের নেতিবাচক দৃষ্টিভংগী

মুসলমানরা বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী প্রতিটি মুমিনের সাথে শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে। প্রকৃতপক্ষে মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। দলমত নির্বিশেষে আহলে বাইতের সকল নেক সদস্যই এর আওতায় পড়েন। যে সকল অনুকরণীয় মুমিনের প্রতি মুসলমানদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা রয়েছে তাঁদের প্রথমেই রয়েছেন সেই দশজন সাহাবী যাঁদের রসূলুল্লাহ (সঃ) জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। অন্য কোন কারণ না থাকলেও আশারায়ে মুবাশশারার জান্নাতের প্রবেশের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাণীর বিরুদ্ধাচরণই কোনও একটি দলকে কাফের ঘোষণা করার জন্য যথেষ্ট। এমনিভাবে মুসলমানরা শ্রদ্ধা পোষণ করেন সাহাবীদের সকলের প্রতি যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত এবং যাঁদের রক্তের বিনিময়ে গোটা বিশ্বে প্রচারিত হয়েছে সত্য ও ন্যায়ের বাণী, উত্তোলিত হয়েছে শান্তি ও কল্যাণের পতাকা, বিজয়ী হয়েছে আল্লাহর দ্বীন।

এমন মহৎ ও উন্নত যাঁদের জীবন , তাঁদেরই চরিত্র হননের জন্য শিয়া গ্রন্থকাররা শত-সহস্র মিথ্যা হাদীস রচনা করেছেন এবং চালিয়ে দিয়েছেন সাইয়েদেনা হযরত আলী (রাঃ) ও তাঁর বুযুর্গ বংশধরদের নামে। সাধারণ শিয়া জনগণকে তাঁরা এ ধারণা দিতে চেষ্টা করেছেন যে, আহলে বাইতের প্রতি বুঝি অন্য সাহাবীরা (নাউযুবিল্লাহ) শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। অথচ হযরত আলী (রাঃ) ও তাঁর সন্তানদের সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ। ইসলামের প্রথম তিন খলীফা ও অন্যান্য সাহাবীর সংগে হযরত আলী (রাঃ) যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক জীবন যাপন করে গেছেন তা মানব সমাজের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আদর্শ হয়ে রয়েছে। কী সুন্দর ভাবেইনা আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাবে সাহাবায়ে কেরামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন -

محمّدٌ رّسول الله والذين معه اشدّاء على الكفّار رحماء بينهم -

"মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সংগে যারা রয়েছে তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর (কিন্তু) পরস্পর অতীব দয়াশীল'' (সূরা আল-ফাত্হ্ আয়াত ২৯)।

আল্লাহ তাআলা সূরা আল হাদীদ–এর ১০ম আয়াতে বলেনঃ"তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পর আল্লাহর পথে ব্যয় ও জিহাদ করবে তারা কখনও সেই লোকদের সমান হতে পারেনা যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও জিহাদ করেছে। তাদের মর্যাদা পরে ব্যয় ও জিহাদকারীদের তুলনায় অনেক বেশী ও বিরাট, এবং উভয়ের প্রতিই আল্লাহ তাআলা উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। "(সূরা ৫৭, আয়াত ১০)। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানের ১১০তম আয়াতে বলেনঃ "তোমরাই দুনিয়ার সর্বোত্তম দল, যাদেরকে মানুষের হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।"

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী তিন ভ্রাতৃপ্রতীম খলীফার প্রতি চতুর্থ খলীফা আমীরুল মুমিনীন হযত আলী মুর্তযা (রাঃ)–এর হৃদ্যতা ও ভালবাসা প্রমাণ করার জন্য এখানে শত–সহস্র ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। তন্মধ্যে যে দ'ুটি ঘটনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় তার প্রথমটি হল, তিনি হাসান, হুসাইন ও ইবনে হানাফিয়ার পর আপন ছেলেদের নাম খলীফাত্রয়ের নামানুসারে রাখেন। পরবর্তী ছেলেদের মধ্যে একজনের নাম রাখেন তিনি 'আবু বকর' অপর একজনের নাম 'ওমর' এবং তৃতীয় আরেকজনের নাম 'ওসমান'।বলা বাহুল্য, প্রথম তিন খলীফার প্রতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতার নিদর্শন স্বরূপই হযরত আলী (রাঃ) তাঁদের নামানুসারে আপন সন্তানদের নামকরণ করেছিলেন। তাছাড়া 'যুল জানাহাইন' উপাধি প্রাপ্ত বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আবু তালেব তাঁর এক পুত্রের নাম রাখেন 'আবু বকর' এবং অপর এক পুত্রের নাম রাখেন 'মুয়াবিয়া'। আর এই মুয়াবিয়া বিন আবদুল্লাহ বিন জা'ফর বিন আবু তালেব তাঁর এক পুত্রের নাম রেখেছিলেন' এযীদ'।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য দ্বিতীয় ঘটনাটি শিয়া ও আহলে সুন্নাহ উভয়ের নিকটই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদুরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী একটি বিষয়। আহলে সুন্নাহ এ ঘটনাটিকে হযরত ওমর ফারুক ও হযরত আলী মুর্তযার মধ্যে বিদ্যমান সদ্ভাব, সৌহার্দ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের একটি বড় ঐতিহাসিক প্রমাণ মনে করে থাকে। অপরদিকে শিয়াদের জন্য ঘটনাটি এক মহাবিপর্যয়। ঘটনাটি এই যে, হযরত আলী (রাঃ) আপন কন্যা উম্মে কুলসুমকে হযরত ওমর (রাঃ)–এর খিলাফতকালেই তাঁর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত ওমরের শাহাদত পর্যন্ত উম্মে কুলসুম তাঁরই গৃহে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর গর্ভে হযরত ওমরের একজন পুত্রসন্তানও জন্ম গ্রহণ করেছিল। শিয়া ইতিহাসবেত্তাদের বর্ণনা অনুযায়ীও উম্মে কুলসুম ছিলেন হযরত ফাতিমা (রাঃ)–এর প্রথমা কন্যা। হযরত ওমরের শাহাদাতের পর উম্মে কুলসুমের বিয়ে আপন চাচাত ভাই মুহাম্মদ বিন জা'ফর বিন আবু তালেবের সাথে সম্পন্ন হয়।

তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর ভাই আওন বিন জা'ফর উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেন। তাঁর কাছে থাকাকালীনই উম্মে কুলসুমের মৃত্যু হয়।

পবিত্র এ বিবাহ এ–কথারও জ্বলন্ত প্রমাণ যে, হযরত আলী (রাঃ)–এর নিকট হযরত ওমর (রাঃ) একজন প্রকৃত মু'মিন ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী সাহাবী ছিলেন। এজন্যই আপন প্রিয়তমা কন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। এটা এমন একটি ঘটনা যা একাই ফারুকে আযম সম্পর্কে শিয়াদের অযুত মিথ্যার শত–সহস্র জাল ছিন্ন করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই শিয়া গ্রন্থকাররা এতদ্‌সংক্রান্ত তাঁদের মিথ্যার নড়বড়ে প্রাসাদকে ধস থেকে রক্ষা করার জন্য এর চতুর্দিকে আরো মিথ্যার প্রলেপ দিয়েছে। এ বিবাহ সম্পর্কে তাঁরা মিথ্যার পর মিথ্যা রিওয়ায়েত তৈরী করেছে। একটিতে বলা হয়েছে যে, হযরত ওমরের প্রচন্ড চাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য হযরত আলী তাঁর মু'জেযার দ্বারা উম্মে কুলসুমের আকৃতির এক কৃত্রিম মেয়ে তৈরী করে ওমর বিন খাত্তাবের কাছে বিয়ে দিয়ে দেন। অপর এক রিওয়ায়েতে জনৈক শিষ্য যুরারাহ ইমাম জা'ফর সাদেক থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এ বিবাহ ইসলামী বিধান মতে অর্থাৎ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে হয়নি। হযরত ওমর জবরদস্তিতে উম্মে–কুলসুমকে আপন গৃহে নিয়ে রেখেছিলেন। তৃতীয় এক রিওয়ায়েতে এ বিবাহের সত্যতাকে আদৌ স্বীকারই করা হয়নি।

শিয়া গ্রন্থসমূহের এতদ্‌সংক্রান্ত একাধিক রিওয়ায়েতে এমন সব অশ্লীল, নির্লজ্জ কথা–বার্তাও এসেছে যেগুলো ইমাম জা'ফর দূরে থাক সাধারণ কোন রুচিবান লোকের মুখ থেকেও বের হতে পারেনা। তাছাড়া এও কি সম্ভব যে, হযরত আলীর ঘর থেকে সাইয়েদা ফাতেমার আদরের দুলালী, রসূলুল্লাহর দৌহিত্রী উম্মে কুলসুমকে কেউ জোর করে ছিনিয়ে নিতে পারে? শিয়া গ্রন্থকাররা কি একবারও চিন্তা করে দেখেননি যে, এ ধরনের রিওয়ায়েত দ্বারা আল্লাহর শার্দুল হযরত আলী মুর্তযাকে কত বড় কাপুরুষ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে? কোথায় ছিল তখন তাঁর ঐতিহাসিক তরবারী 'যুলফিকার', বীর পুত্র হাসান ও হুসাইন, বনী হাশিমের নির্ভীক যুবকদের পৌরুষ ও শাণিত কৃপাণ? অপরদিকে শিয়া গ্রন্থসমূহের সাক্ষ্য অনুযায়ীই তো হযরত আলী হলেন প্রবল পরাক্রমশালী সার্বভৌম ক্ষমতাধর অলৌকিক শক্তির অধিকারী ইমামদের শিরোমণি। যে ইমামগণ পৃথিবীতে যা চান তাই করতে পারেন। যাঁদের কাছে পূর্ববর্তী নবী–রসূলগণের মু'জেযা রয়েছে, মূসা বিন ইমরানের অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন লাঠি রয়েছে। এসব কিছুই ছিল প্রথমতঃ হযরত আলীর কাছেই। তিনি ইচ্ছা করলেই এগুলো দিয়ে ওমরের বস্তুগত শক্তিকে বাধা দিতে

পারতেন কেন দিলেন না?

আসলে এসবই মিথ্যার পাহাড়। সত্য তাই যা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে। হযরত আলী (রাঃ) স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, সাগ্রহে স্বীয় কন্যা উম্মে কুলসুমকে ইসলামের ইতিহাসের, বরং বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ও বীরপুরুষ ওমর ফারুকের নিকট বিবাহ দিয়েছিলেন। তিনি ফারুকে আযমকে আপন কন্যার যোগ্য বর মনে করেছিলেন বলেই এ বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন। যেমন রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ওসমান, হযরত আলী ও আ'স বিন রাবী'কে যোগ্য পাত্র মনে করে আপন কন্যাদের তাঁদের হাতে সম্প্রদান করেছিলেন।

সাহাবাদের চরিত্র হননের অপচেষ্টার ভয়াবহ পরিণতি

ইসলামের প্রথম তিন খলীফা, উম্মাহাতুল মুমিনীন, আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ ও রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর অন্য সকল বিশিষ্ট সাহাবীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করাকে যদি শিয়ারা তাদের সংগে আমাদের আহলে সুন্নাহর ঐক্য স্থাপনের মূল্য হিসেবে সাব্যস্ত করে থাকে, তবে তা যে হবে অত্যন্ত চড়া মূল্য একথা বলাই বাহুল্য। সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে শিয়াদের দৃষ্টিভংগিকে সঠিক বলে স্বীকার করে নিলে তার অপরিহার্য পরিণতি দাঁড়াবে প্রথমতঃ রিসালতের দায়িত্ব পালনে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)–এর অযোগ্যতা ও ব্যর্থতাকে মেনে নেয়া। যা শিয়াদের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও আমাদের আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের সময় আরাফার ময়দানে সমবেত লক্ষাধিক মুসলিম রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর এক প্রশ্নের জবাবে এক বাক্যে সমস্বরে এ স্বীকৃতির ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, রসূলুল্লাহ পরিপূর্ণভাবে তাঁর রিসালত প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছেন। আল–কুরআনেও এ কথার শত শত প্রমাণ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর রিসালতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন। মানুষকে সত্য পথের হিদায়াত দান করেছেন, মানব সমাজে দ্বীনে হক প্রচার করেছেন এবং ইসলামকে অন্যান্য দ্বীনের উপর বিজয়ী করে গেছেন।

শিয়াদের দাবী অনুযায়ী এখন যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর নবুওয়তের দীর্ঘ তেইশ বছরের মক্কী ও মদনী যিন্দেগী নিরলস প্রচেষ্টা এবং ত্যাগ–তিতিক্ষা দ্বারাও অধিক সাথীকে কুফর ও নিফাকের গুমরাহী থেকে মুক্ত করে সত্যিকার হিদায়াত দান করতে পারলেননা, তাদের চরিত্র গঠন করে যেতে পারলেননা, তবে এর চেয়ে অকর্মণ্যতা ও অপারগতা আর কিছু হতে পারে কি? আর হযরত আলী ও তাঁর চারজন সংগীকে যাও বা পারলেন, তাঁরা এমন দুর্বলচেতা, কাপুরুষ ও সুবিধাবাদী হয়ে গেলেন যে, ভয়ের কারণে অথবা সুযোগ–সুবিধা লাভের আশায় তথাকথিত 'তাকিইয়া নীতি'র আশ্রয় গ্রহণ করে দীর্ঘ চব্বিশ বছর তাঁরা বিনা প্রতিবাদে তাঁদের চরম শত্রুদের পরিপূর্ণ আনুগত্য করে গেলেন। (নাউযুবিল্লাহ)।

দ্বিতীয়তঃ সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে শিয়াদের আকীদাকে সঠিক বলে ধরে নিলে আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফের বহু সংখ্যক জায়গায় এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) শত–সহস্র সহীহ হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের ঈমানী শক্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বিশ্বস্ততা, সততা, খোদাভীরুতা, নবীপ্রেম ও আত্মত্যাগের যে প্রশংসা করেছেন তার সবই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে একথা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের দাওয়াতে ও জিহাদে অংশগ্রহণ করাকে জীবনের সর্ববৃহৎ তৃপ্তি ও প্রাপ্তি বলে মনে করতেন, তাঁরা আল্লাহ ও রসূলকে আপন জীবন এবং স্ত্রীপুত্রের চেয়েও অধিক ভালবাসতেন। তৎকালীন বিশ্বের আনাচে–কানাচে, দূর–দূরান্তের জনপদগুলোতে তাঁরাই ইসলামের দাওয়াতকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। পরবর্তী প্রজন্মগুলো তাঁদের নিকট থেকেই ইসলামকে পেয়েছে। সুতরাং ইসলামের বিশ্বাসযোগ্যতা যে সাহাবায়ে কেরামের বিশ্বাসযোগ্যতার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল একথা যুক্তি–প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

তৃতীয়তঃ শিয়া গ্রন্থকারদের বক্তব্য অনুযায়ী ইসলামের প্রথম তিন খলীফা ও তাঁদের সহকর্মীদের কাফির, মুনাফিক, ফাসিক, প্রবঞ্চক, ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী (নাউযুবিল্লাহ) হিসেবে আখ্যায়িত করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দাঁড়ায় কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি অবিশ্বাস ও অনাস্থা প্রকাশ। কারণ, ইসলামের মূল দু'টি উৎসের দ্বিতীয়টি, 'রসূলের সুন্নাহ', সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমেই আমাদের নিকট পৌঁছেছে। এর চেয়ে বড় কথা, ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)–এর শাসনামলে সরকারীভাবে সর্বপ্রথম আল–কুরআনের সংকলন কার্য সম্পন্ন হয়। অতঃপর তৃতীয় খলীফা ওসমান (রাঃ)–এর শাসনামলে গোটা আরব বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান কুরআনের সকল আংশিক ও পূর্নাংগ কপি সংগ্রহ করে এলমে কুরআনে পারদর্শী সাহাবায়ে কেরামের সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ডের মাধ্যমে তা চূড়ান্তভাবে সংকলিত করা হয় এবং এর একাধিক বিশুদ্ধ কপি তৈরি করে তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়। এভাবেই সারা বিশ্বের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে কুরআন শরীফের নির্ভুল ও বিশুদ্ধ কপিসমূহ সর্বস্তরের লোকদের হাতে পৌঁছে যায়। এমতাবস্থায় শিয়াদের সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের মত আমরাও যদি মনে করতে থাকি যে, সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও পার্থিব সুবিধার জন্য কুরআন শরীফে যে কোন ধরনের পরিবর্তন–পরিবর্ধন করতে পারতেন এবং ব্যাপকভাবে তা করেওছেন, তবে ইসলাম ও আল–কুরআনের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় থাকে কিরূপে? সূত্র যদি নির্ভরযোগ্য না হয় তবে তার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে?

চতুর্থতঃ, শিয়া ধর্মগ্রন্থসমূহে সবিস্তারে ও সুস্পষ্টভাবে নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়েতের

আলোকে একথা বলা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর, ওমর প্রমুখ গোড়াতেই কপটভাবে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর আহবানে সাড়া দিয়ে বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কেমলমাত্র রসূলুল্লাহর মৃত্যুর পর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁর প্রতিষ্ঠিতব্য বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের শাসনক্ষমতা হস্তগত করার লক্ষ্যে। সারা জীবন তাঁরা রসূলুল্লাহর সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিলেন তাঁদের অন্তরে লুক্কায়িত এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই। অপরদিকে শিয়াদের এটিও একটি মৌলিক আকীদা যে, ওফাতের আশি দিন পূর্বে বিদায় হজ্জ থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে রসূলুল্লাহ (সঃ) গদীরে খুম নামক স্থানে সকল সাহাবীকে একত্রিত করে একটি বিশেষ ভাবগম্ভীর পরিবেশে অত্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে হযরত আলী ও তাঁর বংশধরদের তিনি অনাগত ভবিষ্যতের জন্য বংশানুক্রমিকভাবে আপন খলীফা, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক ও মুসলিম উম্মার নেতা মনোনীত করে গিয়েছিলেন।

শিয়াদের এ দু'টি আকীদা ও এতদসংক্রান্ত রিওয়ায়েতসমূহ বিচার করে কেউ যদি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ ও আবু বকর ওমরদের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাতের ইতিহাস, তবে কি তা অযৌক্তিক হবে? আসলে হয়েছেও তাই। শিয়া উলামা ও গ্রন্থকারগণ একদিকে মুহাম্মদ (সঃ) ও আলী মুর্তযা এবং অপরদিকে আবু বকর ও ওমর ফারুকের জীবন ও কর্মকে এমনভাবে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন যেন তাঁরা আপন আপন দলীয় স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত পরস্পর বিরোধী দু'টি গোষ্ঠীর প্রতিভূমাত্র। সংকীর্ণ স্বার্থের সংগ্রাম শুরু হয়েছে রসূলুল্লাহর জীবদ্দশায়, চলেছে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে, উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে এবং দু'পক্ষের মধ্যে এ সংগ্রাম চালু থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

কিন্তু আসলে কি অবস্থা তাই? মোটেই নয়। নয় যে এর প্রমাণ স্বয়ং আল–কুরআন, বিপুল সংখ্যক সহীহ ও প্রচুর সংখ্যক মুতাওয়াতির হাদীস, মুসলিম ও অমুসলিম লেখকদের রচিত অযুত লক্ষ পৃষ্ঠা সম্বলিত ইসলামের ইতিহাস এবং সর্বোপরি বর্তমান বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের সঠিক অবস্থা। কৃতি শিয়া লেখকদের কল্পিত রিওয়ায়েতসমূহ ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমেই এ পর্যন্ত আমাদের নিকট এ তথ্য পৌছেনি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনুরূপ কোন বিরোধ ও দলাদলি ছিল। বরং সারা জীবন তাঁরা স্নেহ–ভালবাসা ও প্রীতি প্রেমের যে পূণ্য বাঁধনে আবদ্ধ ছিলেন গোটা বিশ্বের ইতিহাসে তার নজীর নেই।এদদ্ব্যতীত আমাদের ও তাদের মধ্যে এক্য স্থাপনের জন্য যদি প্রথম তিন খলীফা এবং তাঁদের সহকর্মীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করাকে শিয়ারা এরই জরুরী মনে করে,

তবে বলতে হয়, তাদের প্রথম ইমাম হযরত আলী (রাঃ) আপন ছেলেদের নাম আবু বকর, ওমর ও ওসমান রেখে ভুলই করেছিলেন। আর এর চেয়েও বড় ভুল করেছিলেন স্বীয় প্রাণপ্রিয় কন্যাকে হযরত ওমর বিন খাত্তাবের সাথে বিয়ে দিয়ে। আরও বলতে হয় যে, মুহম্মদ বিন হানাফিয়া বিন আলী বিন আবু তালিব সঠিক জবাব দেননি, যখন আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের দূত আবদুল্লাহ বিন মুতী তাঁর নিকট এযীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছিলেন যে, ''এযীদ মদ্যপান করে, নামায পড়েনা এবং কুরআনের বিধান লংঘন করে''। জবাবে মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া বিন আলী (রাঃ) বলেন, (আল–বিদায়াহ ওয়াল নিহায়াহ ৮ঃ ২৩৩ পৃঃ) আপনারা যা বলেছেন তা তো আমি এযীদের মধ্যে দেখিনি, অথচ আমি তাঁর নিকট কিছুদিন অবস্থান করেছি। আমি তো দেখেছি যে,সে নামাযের পাবন্দ, কল্যাণ প্রত্যাশী, ফিক্হ সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেয় এবং সুন্নতের উপর আমল করে।" তখন ইবনে মুতী ও তাঁর সাথীরা বললেন, "ওগুলো ছিল আপনাকে খুশি করার জন্য।" তিনি বলেলেন, আমার কাছে তো তার কোন চাওয়া পাওয়ার ছিলনা যে, সে আমার কাছে বিনয় প্রকাশ করবে। আপনাদের উল্লেখ মতো সে কি তার মদ্যপান সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করেছে? যদি তা করে থাকে তবে বলতে হয় একাজে আপনারাও তাঁর অংশীদার। আর যদি অবহিত করে না থাকে তবে তো এ সম্পর্কে আপনাদের কিছু বলা ঠিক নয়।"

এই যদি হয় এযীদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের প্রতি মুহম্মদ বিন হানাফিয়া বিন আলী বিন আবু তালিবের দৃষ্টিভংগি, যা অত্যন্ত উদার, নিরপেক্ষ ও সুরুচিপূর্ণ, তাহলে আমরা কীভাবে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব হযরত আবু বকর সিদ্দীক, ওমর ফারুক ও ওসমান যুন্নুরাইন (রাঃ) সম্পর্কে শিয়াদের ইচ্ছানুযায়ী চরম অশালীন, অন্যায় ও অসত্য ধারণা পোষণ করতে পারি? যাঁরা আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহর সুন্নতকে সংরক্ষিত রেখে গেছেন, আরো রেখে গেছেন বিপুল সম্পদ, বিরাট সাম্রাজ্য ও সমৃদ্ধ সভ্যতা, তাঁদের সাথে কীভাবে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি? প্রকৃতপক্ষে ঐক্যের জন্য শিয়ারা আমাদের উপর এমন শর্ত আরোপ করে যাতে ষোল আনাই আমাদের ক্ষতি। নিরেট বোকা ছাড়া এমন ব্যক্তির সাথে কে ব্যবসা করতে যায় যে সর্বদাই অংশীদারের ক্ষতি কামনা করে! এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে শিয়া ধর্মের দু'টো মৌলিক আকীদা আহলে বাইতের ইমামত ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ–এর অর্থ দ্বীনে ইসলামের বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের বিভিন্ন মযহাব ও শিয়া সম্প্রদায়সমূহের

Contents

মধ্যে ঐক্য ও নৈকট্য প্রতিষ্ঠার পথে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার প্রধান কারণ হল ধর্মীয় মৌলিক নীতিমালায় অন্য সকল মুসলমানের সাথে তাদের বিরোধ। আল্লামা নাসিরুদ্দীন তুসী একথা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন এবং শায়খ নিয়ামতুল্লাহ মুসাভী ও শায়খ বাকের খোনসারীসহ সকল শিয়া আলেম এর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। সাধারণ শিয়ারাও এ বিশ্বাস পোষণ করে।

আরও উল্লেখ্য যে, বর্তমান যমানায় শিয়াদের বিভিন্ন দল–উপদলের মধ্যে সর্ববৃহৎ শিয়া সম্প্রদায় দ্বাদশ ইমামপন্থী শিয়ারাই শিয়া–সুন্নী ঐক্যের পথে প্রধান অন্তরায়। এজন্যই ইসলামী বিশ্বের সুন্নী দেশসসূহের ঐক্যের দাওয়াত প্রচারে তারা এত শ্রম ও অর্থ ব্যয় করছে। পক্ষান্তরে শিয়া অধ্যুষিত দেশ ও শহরসমূহে তারা এতদুদ্দেশ্যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রচার কার্য পরিচালনা করতে সম্পূর্ণ নারাজ। তারা একেবারেই চায় না যে, তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ দাওয়াতের কোন ছোঁয়াচ লাগুক। তাই শিয়া–সুন্নী ঐক্যের দাওয়াত এ পর্যন্ত এক পক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। যেমনটি আমরা এ পুস্তকের শুরুতেই উল্লেখ করেছি। ফলে, এ দাওয়াতের একমাত্র তুলনা সেই বৈদ্যুতিক লাইন যার 'নেগেটিভ' ও 'পজেটিভ'–এর মিলন ঘটেনা। এ একদেশদর্শীতার কারণেই এক্ষেত্রে নিবেদিত যাবতীয় শ্রম পুতুল খেলার মতই মূল্যহীন রয়ে গেল।

প্রকৃতপক্ষে শিয়া–সুন্নী নৈকট্যের এ মহৎ উদ্যোগে সাফল্য লাভের মাত্র দুটো পথই খোলা আছে। প্রথমতঃ শিয়াদের অবশ্যই হযরত আবু বকর ও ওমর ফারুকের প্রতি অভিশাপ প্রেরণ এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর ওফাত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত শিয়া নয় এমন সকল লোকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের নীতি পরিত্যাগ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত ইমামগণের মর্যাদা মনুষ্যস্তর থেকে উঠিয়ে দেবতার আসনে সমাসীন করার বিশ্বাস বর্জন করতে হবে। কেননা, এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস ও সীমা লঙ্ঘনের কাজ ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং রসূলুল্লাহ ও সাহাবায়ে কেরাম প্রদর্শিত সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। যতদিন শিয়ারা ইসলাম, ইসলামী আকীদা ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বাড়াবাড়ির এ নীতি পরিত্যাগ না করবে, ততদিন তারা বৃহত্তর মুসলিম সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দূরেই ভাসতে থাকবে।

প্রসংগত আমরা এখানে শিয়াবাদ থেকে উদ্ভূত একটি মারাত্মক সমস্যার কথা উল্লেখ করতে চাই। অবশ্য এ পুস্তকে ইতিপূর্বেও এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা হয়েছে। তা হল, মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ইরান ও ইরাকের 'তুদেহ'

পার্টিতে যে কমিউনিজমের অতিরিক্ত প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তা এ শিয়াতন্ত্রেরই সৃষ্ট। এ দু'টি দেশের কমিউনিষ্টগণ মূলতঃ শিয়া সম্প্রদায়ের যুব সমাজ থেকেই এসেছে। পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত এসব যুবক চোখ মেলে যখন দেখতে পেল কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পৌরাণিক উপাখ্যানপূর্ণ ও কল্পিত মিথ্যা তথ্যে ভরপুর শিয়া মযহাবের প্রকৃত অবস্থা, তখন তারা এর প্রতি তাদের আস্থা হারিয়ে ফেলে। আজন্ম লালিত ধর্মবিশ্বাসের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে যাবার পর তাদের অন্তরে সৃষ্ট হয় এক বিরাট শূন্যতা। এমতাবস্থায় হাতের কাছে সম্মুখেই দেখতে পায় তাদের মনের নতুন খোরাক। দেখতে পায় একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী চিন্তা–প্রসূত ও যুক্তি গ্রাহ্য কমিউনিষ্ট আন্দোলন। যার রয়েছে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত সুচিন্তিত বই–পুস্তক ও বর্ণাঢ্য প্রচারপত্র। তাছাড়া রয়েছে একদল যোগ্য প্রচারক ও বৈজ্ঞানিক প্রচার পদ্ধতি। ফলে স্বধর্মে অসন্তুষ্ট শিয়া যুবকরা সহজেই সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তারা যদি প্রকৃত দ্বীনে ইসলামকে জানার সুযোগ পেত এবং শিয়াবাদের ধূম্রজাল থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতো, তাহলে ইসলাম তাদেরকে কমিউনিজমের খপ্পর থেকে নিশ্চিতভাবেই রক্ষা করতে পারতো।

রক্ষা করতে পারতো এজন্য যে, ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম, যুক্তির ধর্ম, বিজ্ঞানের ধর্ম ও প্রগতির ধর্ম। যেকোন যুগে, যেকোন দেশে, যেকোন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার যোগ্যতা ইসলামের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এজন্য ইসলামে মৌলিক কোন পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন পড়েনা। প্রাচীন অথবা আধুনিক যেকোন দর্শন, চিন্তাধারা ও মতবাদের হামলা থেকে ইসলাম তার অনুসারীদের রক্ষা করার পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখে। কমিউনিজমের বড় আকর্ষণ যদি হয় তার সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, তাহলে এর চেয়েও চমৎকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে ইসলাম ধর্মে। তবে এ ইসলাম হতে হবে সেই ইসলাম যা আমরা আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাহ থেকে পেয়েছি সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে–তাবেয়ীনদের পবিত্র জীবন ও কর্মের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিকভাবে দ্বীনে ইসলামের অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন এবং তাঁর মহান দ্বীন ও আমাদের ইসলামী সত্তাকে শত্রুদের বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্র থেকে কিয়ামত পর্যন্ত হিফাযত করুন।

দ্বিতীয় অংশ

নজফ সম্মেলন—১১৫৬হিঃ

শিয়া–সুন্নী ঐক্যের উদ্দেশ্যে উভয়পক্ষের পন্ডিতদের মধ্যে নাদির শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত একটি ঐতিহাসিক বিতর্ক সভা

সম্মেলনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ইরাকের সুন্নী উলামা প্রধান আল্লামা সাইয়েদ আবদুল্লাহ বিন হুসাইন আল–সুয়াইদী (১১০৪–১১৭৪ হিঃ) রচিত স্মৃতিকথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইমামিয়া শিয়া মযহাবের আকীদা, মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান এবং তাদের তথাকথিত শিয়া–সুন্নী নৈকট্য প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত অভিনব প্রয়াসের স্বরূপ উদঘাটনের পর সুধী পাঠকবর্গের খেদমতে আমরা এখানে পেশ করব শিয়া–সুন্নী নৈকট্য স্থাপনের লক্ষ্যে আয়োজিত একটি ঐতিহাসিক সম্মেলন বা বিতর্কসভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইরানী শাসক ও দিগ্বিজয়ী বীর নাদির শাহের আন্তরিক আগ্রহ ও উদ্যোগে বর্তমান ইরাকের অন্তর্ভুক্ত শিয়াদের পবিত্র নগরী নজফে ১১৫৬ হিজরী সনের ২৫ ও ২৬ শাওয়াল বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার শিয়া এবং সুন্নী উলামা, মাশায়েখ ও জনগণের মধ্যে উক্ত বিতর্ক সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নাদির শাহ শুধু এ সভার আয়োজন করেই ক্ষান্ত হননি বরং এর সার্বিক সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন তিনি নিজে। এ বিতর্ক সভায় আহলে সুন্নাহর নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন ইরাকের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম সাইয়েদ আবদুল্লাহ বিন হুসাইন আল–সুয়াইদী আল–আব্বাসী। শিয়া উলামা, মাশায়েখ ও মুজতাহিদীনের নেতৃত্বে ছিলেন প্রখ্যাত শিয়া মুজতাহিদ আল্লামা মোল্লা বাশী। সম্মেলনের শ্রোতা ছিলেন ইরাক, ইরান, তুরস্ক, আফগানিস্তান, সমরকন্দ, বুখারা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার অগণিত মুসলমান এবং নাদির শাহের সেনাবাহিনীর সদস্যবর্গ।

সম্মেলনে শিয়া উলামা, মাশায়েখ ও মুজতাহিদীন সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে তাঁরা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জমায়াহ–এর দৃষ্টিভংগি ও আকীদাকে সঠিক বলে স্বীকার করে নেবেন এবং এক্ষেত্রে শাহ ইসমাইল সাফাভী কর্তৃক প্রবর্তিত সকল জঘন্য বিদআত ও গুমরাহীকে পরিত্যাগ করবেন। নির্দ্বিধায় তাঁরা এ সত্য মেনে নেবেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর ওফাতের পর তাঁর খলীফা ও মুসলমানদের ইমাম হিসেবে সাহাবায়ে কেরাম উম্মতের সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির হাতে বয়আত করেছিলেন, যিনি হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। অন্য সকল সাহাবীর সাথে হযরত আলী মুর্তযাও তাঁর হাতে বয়আত করেছিলেন। অতঃপর হযরত আবু বকর তাঁর দ্বীনী ভাই হযরত ওমর ফারুকের জন্য সাহাবাদের বয়আত গ্রহণ করেন এবং অন্যান্যদের সাথে হযরত আলীও তাঁর হাতে বয়আত করেন। তারপর সর্বসম্মতিক্রমে খলীফা নির্বাচিত হন হযরত ওসমান যুন্নুরাইন (রাঃ)। হযরত ওসমানের পর খিলাফত প্রাপ্ত হন হযরত

আলী (রাঃ)। এই হল খুলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতের ক্রমধারা, আর এই হচ্ছে মর্যাদার দিক থেকে তাঁদের তুলনামূলক অবস্থান। এক্ষণে, যে ব্যক্তি এর বিপরীত কিছু বলবে ও বিশ্বাস করবে তার উপর আল্লাহর ফিরিশতাকুলের ও সকল মানুষের লা'নত।

দুই দিন ব্যাপী এ সম্মেলনের প্রথম দিনের বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং দ্বিতীয় দিনের বৈঠক শেষে কুফার জামে মসজিদে জুম্আর খুতবায় তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়। ১১৫৬ হিজরী সনের ২৬ শওয়াল শুক্রবারের এ জুমআয় অন্যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং নাদির শাহ এবং তাঁর সেনাপতি ও পারিষদবর্গ। আজ থেকে ন্যূনাধিক আড়াই শ' বছর পূর্বে শিয়া উলামা ও মুজতাহিদীন নাদির শাহের নেক উদ্যোগে সাড়া দিয়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছিলেন, সত্যিকার অর্থে তাকে শিয়া–সুন্নী ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। ১১৫৬ হিজরী সনের নজফ সম্মেলন ছিল, প্রকৃতপক্ষে, শিয়া–সুন্নী ঐক্যের প্রথম আন্তরিক প্রয়াস। কারণ, নজফ সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই সর্বপ্রথম আহলে সুন্নাহ ও শিয়াদের মধ্যকার মৌলিক বিরোধগুলো দূরীকরণের বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

কিন্তু কতিপয় শিয়া ধর্মীয় নেতা বিভিন্ন সুন্নী দেশে বর্তমানে শিয়া–সুন্নী নৈকট্য প্রতিষ্ঠার নামে যে উদ্দেশ্যমূলক ও একদেশদর্শী প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন, তা যুক্তি, ন্যায়নীতি ও ধর্মবিশ্বাস, কোনটির সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই, আহলে সুন্নাহ ও শিয়া উভয় কর্তৃকই এধরনের প্রচার কার্য সমভাবে পরিত্যাজ্য। কারণ, সরকারী সমর্থনপুষ্ট প্রচারকদের এসব পক্ষপাতদুষ্ট প্রচারণার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করলে শিয়া এবং সুন্নী উভয় মযহাবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর ফলে এমন কি তৃতীয় একটি মযহাবের উদ্ভব হতে পারে এবং এভাবে ইসলামে আরো একটি নতুন ফিরকা সংযোজিত হতে পারে। তাই দেখা যায়, কোন কোন শিয়া মুজতাহিদও নৈকট্যের এ নতুন আন্দোলনকে সমর্থন দিচ্ছেন না।

নজফ সম্মেলন সম্পর্কে গল্পের মত আকর্ষণীয় যে বিবরণটি এক্ষুনি আপনারা পড়বেন তা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন সম্মেলনের প্রাণ–পুরুষ সাইয়েদ আবদুল্লাহ সুয়াইদী। ১৩২৩হিজরী সনে এটা কায়রোর 'সায়াদত' প্রেস থেকে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। তখন এর নামকরণ করা হয়েছিল

"الحجج القطعية لاتفاق الفرق الاسلامية"

অর্থাৎ ইসলামী ফিরকাসমূহের ঐক্যের অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু খুব ব্যাপকভাবে প্রচারিত না হওয়ায় আলেম সমাজের অনেকেই গ্রন্থটি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। বড় বড় গ্রন্থাগার ছাড়া সাধারণভাবে এর কপিও সহজলভ্য ছিলনা। তাই আমরা শিয়া-সুন্নী ঐক্যের নামে নতুন ফিতনা শুরু হবার পর দুষ্প্রাপ্য এ মূল্যবান সনদটির পুনঃপ্রকাশ ও ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলাম। আশা করি এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলেই উপকৃত হতে পারবেন।

নজফ সম্মেলনের প্রধান ও এ ঘটনার লেখক সাইয়েদ আবদুল্লাহ সুয়াইদীর পুরো নাম হল, আবুল বরাকাত বিন সাইয়েদ হুসাইন বিন মারআ বিন নাসেরুদ্দীন সুয়াইদী। সুয়াইদী পরিবার বাগদাদের একটি অভিজাত ঐতিহ্যবাহী পরিবার। সুয়াইদী পরিবার বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফাদের বংশধর। সাইয়েদ আবদুল্লাহ ১১০৪হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৭৪হিজরীতে পরলোকগমন করেন। নজফ সম্মেলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। যাঁদের নিকট থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন, আহমদ বিন আবুল কাসেম আল-মাগরেবী, সাইয়েদ আহমদ বিন মারআ সুয়াইদী, শায়খ সুলতান জাবুরী, মুহাম্মদ বিন আকীলা মক্কী, শায়খ আলী আনসারী প্রমুখ।

সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের উলামায়ে কেরাম তাঁর সরলতা, ধার্মিকতা ও পান্ডিত্যের প্রশংসা করেছেন। হাদীস, তফসীর, ফিকহ, আরবী সাহিত্য ও পর্যটনের উপর তিনি বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমাদের আলোচ্য নজফ সম্মেলনের পর পরই তিনি হজ্জ উপলক্ষে মক্কা গমন করেন। প্রকৃতপক্ষে নজফের বিতর্ক সভায় অর্জিত বিজয় এবং নাদির শাহ ও শিয়াদের সাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারার সাফল্যই তাঁকে হজ্জে যেতে উৎসাহিত করে। ইসলামের এ বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেয়ার তৌফীক প্রদানের জন্য হজ্জে গিয়ে তিনি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেন। হজ্জের সফরনামায় তিনি এ তথ্য সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

সম্মেলনের পটভূমিকা

ঐতিহাসিক নজফ সম্মেলন সম্পর্কে সাইয়েদ আবদুল্লাহ বিন হুসাইন আল-সুয়াইদী রচিত স্মৃতিকথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على رسوله سيّدنا محمّد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ـ أمّا بعد :

আল্লাহ তা'আলা যখন আমাকে তাঁর প্রিয় দ্বীনকে বিজয়ী করা এবং বিদআত ও ফিতনা সৃষ্টিকারীদের পরাজিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখার তৌফিক দান করলেন, তখন আমি হজ্জ ও আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার সংকল্প করলাম। এ হজ্জের উদ্দেশ্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। এ জন্য যে, দ্বীনের খেদমত করার যে একটি উদগ্র বাসনা ছিল আমার অন্তরে তা তিনি পূর্ণ করেছেন। আমাকে তিনি উম্মতের একটি বিরাট কল্যাণ সাধনের সুযোগ দিয়েছেন, আমার হাত দিয়ে সত্যকে বিজয়ী করেছেন, মিথ্যার আগুন নিভিয়ে দিয়েছেন, শিয়াদের সাহাবায়ে কেরামকে গালি দেবার নীতি থেকে ফিরিয়ে এনেছেন, হযরত আলীকে সকল সাহাবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং খিলাফতের একমাত্র হকদার বলে মনে করার ভুল ধারণা থেকে তাদের বিরত রেখেছেন। তাছাড়াও আল্লাহ তা'আলা শিয়াদের আমার মাধ্যমে মুতআ'-বিবাহসহ আরো অনেক প্রকার পাপাচার, অন্যায় কাজ, বিদআত গুমরাহী ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করেছেন। নাদির শাহের উদ্যোগে আয়োজিত বিতর্ক সভায় শিয়া উলামা, মাশায়েখ ও মুজতাহিদীনের বিরুদ্ধে আমার এ বিজয় ছিল আমার ও ইসলামী উম্মাহর উপর আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ।

সংক্ষেপে ঘটনাটি এরূপ। ইরানী সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে আফগানরা যখন শাহ হুসাইনকে হত্যা করে ইস্পাহান দখল করে নেয় (১১৩৫হিঃ), তখন তাঁর পুত্র

তহমাসিব পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ, হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার ও পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নেন। ইরান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে লোক সংগ্রহ করে তিনি এ বিরাট সৈন্য বাহিনী গড়ে তোলেন। যেসব সেনাধ্যক্ষ তাঁর সংগে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন তন্মধ্যে নাদির শাহের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তহমাসিব সাহসী হলেও খুব বিচক্ষণ ও প্রজাবৎসল শাসক ছিলেননা। মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন। নির্ভীক সেনাপতি নাদিরকে পদোন্নতি দিয়ে তিনি তাঁকে ই'তিমাদুদ্দৌলা উপাধি প্রদান করেন এবং প্রধান ওজীর নিযুক্ত করে তাঁর হাতে রাজ্য পরিচালনার সকল দায়িত্ব ন্যস্ত করেন।

দূরদর্শী ও উচ্চাভিলাষী নাদির নতুন দায়িত্ব হাতে পেয়েই হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করলেন। প্রথমেই তিনি আফগান শক্তিকে পর্যুদস্ত করে ইস্পাহান পুনর্দখল করেন। তাঁর এ কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি 'তহমাসিব কুলী' উপাধিপ্রাপ্ত হন, যার অর্থ তহমাসিবের দাস। অতঃপর তিনি উসমানীয়দের দখলীকৃত এলাকাসমূহ পুনরুদ্ধারের সংকল্প গ্রহণ করেন এবং এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বাগদাদ অবরোধ করেন। বাগদাদে তখন উসমানীয় গভর্ণর ছিলেন মন্ত্রীর পুত্র আহমদ পাশা বিন হাসান পাশা। তাঁর সংগে নগর রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন আরো তিনজন মন্ত্রী কারা মুস্তফা পাশা, সারা মুস্তফা পাশা, ও জামাল পাশা। তবে তাঁদের উপর কোন অবস্থায়ই অগ্রবর্তী হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ার নির্দেশ ছিলনা। নির্দেশ ছিল যে, মাথার পাগড়িটি বাইরে পড়ে গেলেও প্রাচীর ডিংগিয়ে তাঁরা তা কুড়িয়ে আনতে যাবেননা।

নাদিরের সৈন্যরা আট মাস যাবৎ বাগদাদ অবরোধ করে রেখেও নগরবাসীদের আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করতে পারলনা। শেষ পর্যন্ত আক্রমণকারীদের রসদ ফুরিয়ে গেল। তারা ঘোড়া, গাধা এমনকি কুকুর-বিড়ালের মাংস খেতে বাধ্য হল। তবুও তারা অবরোধ পরিত্যাগ করল না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের হাত থেকে বাগদাদকে রক্ষা করলেন। উসমানীয় সম্রাট তোবাল উসমান পাশার নেতৃত্বে এক শক্তিশালী বাহিনী বাগদাদে প্রেরণ করেন। তুমুল যুদ্ধের পর আক্রমণকারীরা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। নব বলে বলীয়ান হয়ে আবার তারা বাগদাদ আক্রমণ করে কিন্তু এবারও তারা ব্যর্থ হয়। অতঃপর তারা রোমের দিকে অগ্রসর হয় কিন্তু, এখানেও তাদের অগ্রগতি প্রতিহত করা হয়। প্রত্যাবর্তনের সময় ১১৪৮ হিঃ সনে পথে তিনি সৈন্যদের নিকট থেকে শাসক হিসেবে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন এবং নিজে শাহ উপাধি ধারণ করেন।

অতঃপর নাদির শাহ তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। পথিমধ্যে বিভিন্ন দূর্গ ও নগর দখল করে অপ্রতিহত গতিতে জাহানাবাদ এসে পৌছান। জাহানাবাদই ছিল তখন ভারতীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী। প্রচন্ড যুদ্ধের পর তিনি এটা অধিকার করে নেন এবং প্রচুর ধন–রত্নের মালিক হন। জাহানাবাদ দখল করে নেবার পরও তিনি এর শাসক শাহ মুহাম্মদের সংগে একটি সন্ধি চুক্তি সম্পন্ন করেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী স্থিরীকৃত হয় যে, নাদির শাহের পক্ষ থেকে শাহ মুহাম্মদই শাসনকার্য পরিচালনা করবেন এবং প্রতি বছর শাহকে একটি নির্দিষ্ট অংকের কর প্রদান করবেন। হিন্দুস্থান থেকে তিনি তুর্কিস্তানের দিকে অগ্রসর হন এবং বলখ ও বুখারা দখল করে নেন। মোটকথা, আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান ও ইরানের সকলেই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। হিন্দুস্তানের শাহ মুহাম্মদ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেয়ার পর নাদির শাহ 'শাহানশাহ' উপাধি গ্রহণ করেন এবং সকলকে কঠোর নির্দেশ প্রদান করেন যেন কেউ তাঁকে "শাহানশাহ" ছাড়া অন্য কোন নামে সম্বোধন না করে।

হিন্দুস্থান থেকে প্রাপ্ত প্রচুর মণিমাণিক্য ও বিপুল ধন–সম্পদ অকাতরে ব্যয় করে নাদির শাহ এক অপরাজেয় সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। মরুভূমির বালিকণার মত অগণিত সৈন্য সম্বলিত বিপুল বাহিনী নিয়ে তিনি আবার দিগ্বিজয়ে বাহির হন এবং ১১৫৬ হিজরী সনে ইরাক প্রবেশ করেন। বাগদাদ অবরোধের জন্য সত্তর হাজার ও বসরা অবরোধের জন্য নব্বই হাজার সৈন্য রেখে তিনি আশপাশের ছোটখাট শহর–বন্দর দখল করার জন্য বহু সংখ্যক ছোট ছোট সেনাদল ছড়িয়ে দেন। নাদির শাহ নিজে আরেকটি বাহিনী নিয়ে শাহরেজোরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং কুর্দী ও বেদুইনসহ সেখানকার অধিবাসীরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিল। তারপর তিনি কারকুক দূর্গ অবরোধ করলেন। আট দিনের অবরোধের পর দূর্গের অধিবাসীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। অতঃপর ইরবিল দূর্গ দখল করে দুই লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে মুসেলের দিকে অগ্রসর হলেন। দীর্ঘ দিন অবরোধ করে রাখার পরও যখন মুসেলবাসীরা আত্মসমর্পণের কোন লক্ষণ দেখালনা এবং বুঝতে পারলেন যে, মুসেল অবরোধ তাঁর জন্য কোন ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবেনা, তখন তিনি সেখানকার অবরোধ উঠিয়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাগদাদের দিকে অগ্রসর হলেন।

বাগদাদ অবরোধ করার পর এখানকার উসমানীয় গভর্ণর আহমদ পাশার সাথে তিনি আবার কূটনৈতিক যোগাযোগ শুরু করেন। এবার নাদির শাহ, যিনি নিজে শিয়া ছিলেন, বাগদাদের সুন্নী গভর্ণরকে কিছুটা ছাড় দিতে রাজী হলেন। এবার তিনি সুন্নী

কর্তৃক শিয়া মযহাবকে সঠিক বলে মেনে নেয়া এবং একে ইমাম জাফর সাদেকের মযহাব হিসেবে স্বীকার করে নেয়ার শর্তটি তুলে নেন। সুন্নীদের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ একটি নৌকোতে দজলা পার হয়ে প্রথমেই তিনি ইমাম আবু হানিফার মাজার যিয়ারত করেন। এরপর তিনি হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ)–এর মাজার যিয়ারত করা এবং তাঁরই নির্দেশে মাজারে নির্মিতব্য স্বর্ণ গম্বুজের কাজ পরিদর্শনের জন্য নজফের দিকে অগ্রসর হন।

২১ শওয়াল রবিবার সন্ধ্যার পূর্বে আমি মাগরিবের অপেক্ষায় বসে আছি এমন সময় গভর্ণর আহমদ পাশার জনৈক দূত আমাকে দরবারে হাজির হবার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন। মাগরিবের পর আমি গেলাম এবং দরবার কক্ষে প্রবেশ করলাম। গভর্ণরের অন্যতম উপদেষ্টা ও উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা আহমদ আগা আমার কাছে এসে প্রশ্ন করলেনঃ

–আপনি জানেন কি, কেন আপনাকে ডাকা হয়েছে?

–আমি বললাম, না।

–পাশা আপনাকে নাদির শাহের নিকট পাঠাতে চান।

–কী জন্য?

–নাদির শাহ এমন একজন বিজ্ঞ আলেম খোঁজ করছেন যিনি শিয়া আলেমদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হবেন এবং শিয়া মযহাবকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার যুক্তি প্রদর্শণ করবেন। পক্ষান্তরে শিয়া আলেমগণ তাঁদের মযহাবকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য দলিল পেশ করবেন। আমাদের আলেম বিজয়ী হলে নাদির শাহ তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

আমার কানে কথাগুলো পৌঁছা মাত্র আমার শরীর শিহরিয়ে উঠল, আমি ভয়ে কম্পিত হয়ে গেলাম। আমি বললামঃ–

জনাব আহমদ আগা, আপনি তো জানেন, রাফেজীরা কতো অহংকারী ও একগুঁয়ে। তারা কেন আমার কথা মানতে যাবে? বিশেষতঃ তারা যখন সংখ্যায় ও শক্তিতে অনেক বেশী। তাদের শাহও তো অত্যাচারী এবং স্বৈরাচারী। এমতাবস্থায় কী করে আমি তাঁর মযহাবকে ভ্রান্ত ও তাঁর বিশ্বাসকে অজ্ঞতা প্রসূত বলে প্রমাণ করার দুঃসাহস দেখাতে পারি? কী করে তাদের সাথে বিতর্ক চলতে পারে? তারা তো আমাদের সকল দলিল প্রমাণকে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। সিহাহ সিত্তা ও আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থকে তারা অবিশ্বাস করে। কুরআন

শরীফের যে আয়াতই আমরা দলিল হিসেবে পেশ করব তারা এর অন্যরকম ব্যাখ্যা প্রদান করবে। আমাদের যুক্তি-প্রমাণ যতই বিবেক সম্মত এবং শরীয়ত ভিত্তিক হোক না কেন, তারা তা সরাসরি অগ্রাহ্য করবে। এমতাবস্থায়, মোজার উপর মসেহ করার বৈধতা আমি কীভাবে তাদের নিকট প্রমাণ করব? অথচ এটা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত। আমি যদি বলি, মোজার উপর মসেহ করার হাদীস প্রায় সত্তর জন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আলী মুর্তযা, তাহলে তারা বলে উঠবে, মসেহ করার অবৈধতা আমাদের নিকট একশ'রও অধিক সাহাবীর রিওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত যাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবু বকর ও ওমর। আমি যদি বলি, মসেহ-এর অবৈধতা প্রমাণের জন্য তোমরা যেসব হাদীসের কথা বলছো সেগুলোর সবই মিথ্যা, জাল, বানানো। সংগে সংগে তারা বলে বসবে, তোমাদের হাদীসগুলোও ভিত্তিহীন, মনগড়া, বানোয়াট। কিছুতেই তারা সত্যকে স্বীকার করে নেবেনা। তাই শ্রদ্ধেয় গভর্ণরের নিকট আমার আরজ, আমাকে এ গুরুদায়িত্ব থেকে অব্যাহিত দেয়া হোক এবং এজন্য হানাফী অথবা শাফেয়ী মযহাবের কোনও একজন যোগ্য মুফতীকে প্রেরণ করা হোক। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মুফতীগণই অধিকতর উপযোগী।

আহমদ আগা বললেনঃ এ কাজটি সম্পূর্ণ অসম্ভব। শ্রদ্ধেয় পাশা যখন আপনাকে মনোনীত করেছেন, তখন আপনার পক্ষে তাঁর আনুগত্য করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমার অনুরোধ, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি কিছুই বলতে যাবেন না।

পরদিন সকালে আমি ওজীর আহমদ পাশার সংগে মিলিত হলাম। তিনি আমার সাথে এবিষয়ে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা করলেন। অবশেষে বললেনঃ

আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন আপনাকে বিজয়ী করেন, আপনার মুখ দিয়ে যেন সত্য নির্গত করেন। বিতর্কে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আপনি স্বাধীন। কিন্ত আমার পরামর্শ, আপনি এতে অংশ নিন। আপনার বিশ্বাসের সমর্থনে আপনি যুক্তি প্রমাণ পেশ করুন। যেন প্রতিপক্ষ বুঝতে পারে যে, আপনি একজন পন্ডিত মানুষ। আপনি যদি উপলব্ধি করেন যে, তাদের মধ্যে ইনসাফ রয়েছে এবং সত্যকে মেনে নেয়ার মানসিকতা রয়েছে, তবে শেষ পর্যন্ত বিতর্ক চালিয়ে যাবেন। কিন্তু কোন অবস্থায়ই তাদের নিকট নতি স্বীকার করবেন না।

তারপর তিনি বললেন, "নাদির শাহ এখন নজফে রয়েছেন। আমি চাইযে, বুধবার সকালে আপনি তাঁর দরবারে উপস্থিত হবেন।" একথা বলে আমাকে মূল্যবান একপ্রস্থ পোশাক, একটি সওয়ারী ও একজন খাদেম প্রদান করলেন এবং তাঁর কয়েকজন

অনুচরকে আমার সহযোগী হবার নির্দেশ দিলেন।

২২শে শওয়াল সোমবার যোহরের পর আমরা রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে আমি একটাই মাত্র চিন্তায় মগ্ন রইলাম। কল্পনা করতে লাগলাম উভয় পক্ষের যুক্তিসমূহ কী হতে পারে এবং এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর কী হতে পারে। প্রতিপক্ষ যদি আমার কোন যুক্তির জবাব দিয়ে পাল্টা কোন প্রশ্ন রাখে তবে আমি তার কী জবাব দিব। এভাবে সারাটি পথে আমি কল্পনায় আমার ও আমার প্রতিপক্ষের যুক্তি–প্রমাণের চিত্র অঙ্কিত করে চললাম। শেষ নাগাদ আমার স্মৃতিপটে এক'শরও বেশী যুক্তি জমা হয়ে গেল। প্রত্যেকটি যুক্তিরই একাধিক বিকল্প জবাব তৈরী করে রাখলাম। রাস্তায় আমার শরীর খারাপ হওয়ায় বিশ্রামের জন্য পার্শ্ববর্তী একটি মহল্লায় প্রবেশ করলাম। সেখানে আহলে সুন্নাহর কিছু লোক আমাদের অবহিত করল যে, শাহ এ বিতর্ক সভার জন্য তাঁর দেশ থেকে বহু সংখ্যক মুফতী ডেকে আনিয়েছেন। এ পর্যন্ত তাঁদের সংখ্যা সত্তরে দাঁড়িয়েছে। সকলেই রাফেজী।

আমার কানে একথা পৌছামাত্র আমি বিপদের পূর্বাভাস পেয়ে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করলাম। আমি নিজেকে বলতে লাগলাম, আমি আর এখন বিতর্ক এড়িয়ে চলার কথা ভাবতে পারিনা। আবার আমি যদি বিতর্কে অবতীর্ণ হই তবে এমনও হতে পারে যে, যা ঘটবে তার বিপরীত শাহের নিকট পৌছবে। অনেক চিন্তার পর আমি এ সিদ্ধান্তে পৌছলাম যে, শাহের অনুপস্থিতিতে আমি বিতর্কে যাবনা। আমি শাহকে বলব যে, বিতর্কে একজন বিজ্ঞ বিচারকের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। তিনি সুন্নীও হবেন না, শিয়াও হবেন না। যেন পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন উঠতে না পারে। তিনি ইহুদী হতে পারেন, খৃষ্টান হতে পারেন অথবা অন্য কোন ধর্মমতের অনুসারী হতে পারেন। কিন্তু কোন অবস্থায়ই শিয়া বা সুন্নী হবেন না। আমি আরো বলব যে, আমরা বিচারক হিসেবে আপনাকে মেনে নিতে রাজী আছি। আপনি কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করবেন। আপনিই এ গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

আমি আরো চিন্তা করে রাখলাম, যদি শাহের রায় পক্ষপাতদুষ্ট হয়, তবে আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করব এবং তাঁকে প্রকৃত সত্য বুঝাতে চেষ্টা করব। এজন্য যদি আমাকে হত্যাও করা হয়, তবুও পরোয়া করবনা। অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংগীদের নিয়ে গভীর রাতে মহল্লা থেকে বের হয়ে পড়লাম। ঝাপ্টা বাতাসসহ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। আঁধার এত ঘন যে, আমরা নিজের হাতও দেখতে পাচ্ছিলামনা। ঝড়, বৃষ্টি ও প্রচন্ড শীতে পথ চলা অত্যন্ত কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্য পথে আমরা কোথাও থামলামনা।

সারারাত চলার পর 'মাশহাদে যুল–কিফ্‌ল্' নামক স্থানে এসে একটু বিশ্রাম নিলাম। বিশ্রামের পর আবার পথে নামলাম। দানদান কূপের নিকট পৌঁছে ফজরের নামায আদায় করে বসার পরই দেখতে পেলাম যে, শাহের জনৈক সংবাদবাহক আমাদের দিকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। কাছে এসেই আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি করুন। শাহ এক্ষুনি আপনাকে চান।" সংবাদবাহককে আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ

–রাজা–বাদশাহদের নিকট থেকে যখন শাহের নিকট কোন দূত পাঠানো হয় তিনি কিভাবে তাঁকে গ্রহণ করেন? আমার মত সরাসরি পথিমধ্যে থেকেই কি ডেকে পাঠান নাকি একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর তলব করেন?

–আপনি ছাড়া আর কাউকে কোনদিন তিনি সরাসরি পথ থেকে ডেকে পাঠান নি।

একথা শুনে আমার শরীর শিহরিয়ে উঠল। আমি নিজেকে বললাম, "তোমার প্রতি শাহের এ জরুরী তলব এজন্যই এসেছে যে, তিনি ইমামিয়া মযহাব সম্পর্কে তোমার স্বীকৃতি আদায় করতে চান। প্রথমতঃ হয়তো তোমাকে সম্পদের লোভ দেখানো হবে। তাতে কাজ না হলে তোমার উপর চাপ প্রয়োগ করা হবে। এমতাবস্থায় তোমার অভিমত কী?" সহসাই আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, আমি সত্য বলব। মৃত্যুর আশংকা দেখা দিলেও আমি সত্য থেকে বিচ্যুত হবনা। কোন লোভ আমাকে আকৃষ্ট করতে পারবেনা। কোন হুমকিই আমাকে বিচলিত করতে পারবেনা। রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর ওফাতের দিন ইসলাম থেমে গিয়েছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)–এর কারণে আবার চলতে শুরু করে। দ্বিতীয়বার ইসলামের গতি থেমে যায় যখন আল–কুরআনকে সৃষ্টি বলে ঘোষণা করা হয়। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের আত্মত্যাগের বিনিময়ে সেবারও ইসলাম গতি ফিরে পায়। আজকের দিনে তৃতীয়বারের মত ইসলামের গতি থেমে গেছে। আমি যদি আজ থেমে যাই তবে কোনদিন ইসলাম আর গতি ফিরে পাবেনা। আমি যদি চলতে থাকি তবে ইসলামেও চিরদিনের জন্য গতি সঞ্চারিত হবে। প্রকতপক্ষে ইসলামের সুপ্তি ও গতি নির্ভর করে তার অনুসারীদের সুপ্তি ও গতির উপর। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, জনগণের আমার উপর ভাল ধারণা রয়েছে। তারা মনে করে, আমি যদি ঠিক থাকি ইসলামের কল্যাণ হবে। আমি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাই তবে ইসলামের ক্ষতি হবে। তাই আমি আমার সংকল্পকে দৃঢ় করলাম। সত্যের জন্য মৃত্যু বরণ করার শপথ নিলাম। মুখে কলেমায়ে তাইয়েবা ও কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করতে লাগলাম। এভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে সওয়ারী সামনে চালালাম।

কিছুদূর গিয়েই দেখি আকাশে উড়ছে বিরাট দ'টো পতাকা। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেই আমাকে বলা হল, এ দু'টো শাহের পতাকা। তাঁর তাঁবুর সামনে এগুলো উত্তোলিত থাকে, যেন সেনাপতিরা দূর থেকেই তাঁর অবস্থান সম্পর্কে অবহিত থাকতে পারেন। কেউ কেউ পতাকার ডান দিকে অবস্থান গ্রহণ করেন আবার কেউবা বাম দিকে। আরো কিছুদূর যাবার পর শাহের তাঁবু দেখতে পেলাম। বড় বড় ও উঁচু সাতটি খুঁটির উপর তাঁর তাঁবুটি খাটানো। আরেকটু এগিয়ে তাঁদের ভাষায় 'কাশক খানা'র নিকট পৌছালাম। 'কাশক খানা' হচ্ছে পরস্পর মুখোমুখি অনেকগুলো তাঁবুর দু'টো লাইন। প্রত্যেক লাইনে ১৫টি করে তাঁবু। প্রতিটি তাঁবুই গম্বুজাকৃতির। ডান দিকের তাঁবুগুলোতে সদাজাগ্রত চার হাজার বন্দুকধারী প্রহরী। বামদিকেরগুলো খালি, সারি সারি চেয়ার পাতা।

কাশ্‌ক্‌ খানার সামনে গিয়ে অবতরণ করা মাত্র আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য একজন লোক বের হয়ে আসল। আমাকে সে সাদর সম্ভাষণ জানাল, আপ্যায়ন করল আন্তরিকভাবে। বার বার সে আমার নিকট পাশা ও তাঁর বিশিষ্ট সাথীদের ব্যাপারে জানতে চাইল। যখন সে বুঝতে পারল যে, আমি এতে বিস্ময় বোধ করছি, তখন জিজ্ঞাসা করলঃ

–মনে হচ্ছে আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি।

–বললাম, হাঁ।

–সে বলল, আমি আবদুল করিম বেগ। আহমদ পাশার দ্বাররক্ষক হিসেবে কিছুদিন আমি কাজ করেছি। এখন আমাকে ইরানী সাম্রাজ্যের তরফ থেকে উসামানীয় সাম্রাজ্যে দূত হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

সে আমার সংগে কথা বলতে থাকা অবস্থায়ই আরো নয়জন লোক এগিয়ে আসলেন। এঁদের উপর তার দৃষ্টি পড়তেই সে সটান দাঁড়িয়ে অভিবাদন করল। তাঁরা আমাকে সালাম করলেন। আমি তাঁদের চিনতে পারলামনা। বসেই আমি তাঁদের সালামের জবাব দিলাম। আবদুল করিম একজন একজন করে তাঁদের আমার সংগে পরিচিত করতে লাগল।

–ইনি মি'য়ারুল মামালিক হাসান খান, ইনি মুস্তফা খান, ইনি নজর আলী খান, ইনি মির্যা কাফী খান। ... ... মি'য়ারুল মামালিকের কথা শুনেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। মি'য়ারুল মামালিক হলেন শাহের মন্ত্রী। তিনি ও তাঁর সংগের সকলেই আমার সংগে করমর্দন করলেন এবং স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। তারপর তাঁরা বললেন, 'আসুন শাহের সংগে সাক্ষাৎ করুন।'

একথা বলেই এগিয়ে গিয়ে কাশ্‌ক্ খানার মাথায় রোয়াকের মাঝখানের দরজায় ঝুলানো পর্দা উপরে উঠালেন। দেখলাম এর পেছনে রয়েছে আরেকটি রোয়াক। মাঝখানের দূরত্ব মাত্র তিন গজ। আমাকে তাঁরা ওখানে থামিয়ে বললেন, 'আমরা থামলে আপনিও থামবেন আর আমরা চললে আপনিও চলবেন।'

ওখান থেকে বাম দিকে মোড় নিলাম। দ্বিতীয় রোয়াকের শেষ মাথায় দেখতে পেলাম প্রশস্ত একটি কালো পর্দা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল এরপর রয়েছে আরেকটি রোয়াক। পাশেই অনেকগুলো তাঁবু। এ তাঁবুগুলোতে রয়েছেন শাহের স্ত্রীগণ। এখান থেকে আমি শাহের তাঁবুর দিকে তাকালাম। দেখলাম আমার নিকট থেকে তিনি মাত্র এক ঢিলের দূরত্বে একটি সুউচ্চ সিংহাসনে সমাসীন। আমার উপর দৃষ্টি পড়তেই তিনি উচ্চ স্বরে চিৎকার করে উঠলেনঃ

–মারহাবা, আবদুল্লাহ আফিন্দী। আহমদ পাশা আমাকে বলেছে যে, সে আমার নিকট আবদুল্লাহ আফিন্দীকে পাঠিয়েছে। তারপর তিনি বললেন, 'এগিয়ে আসুন'। আগের মত একটু এগিয়ে আমি আবার থেমে গেলাম। এভাবে তিনি আমাকে বলতে লাগলেন, 'এগিয়ে আসুন' আর আমি এগুতে থাকলাম ছোট ছোট পদক্ষেপে। অবশেষে তাঁর পাঁচ হাত নিকটে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বসে থাকা সত্ত্বেও স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছিল যে, তিনি একজন দীর্ঘদেহী মানুষ। মাথায় সাদা টুপি। টুপির উপর মণিমুক্তা খচিত বহুমূল্য পাগড়ি। গলায় মুক্তার মালা। বাহুতেও তাই। চেহারায় ভাসছে বয়সের ছাপ। সামনের পাটির দাঁত পড়ে গেছে। বয়স মনে হল আশির কাছাকাছি। দাঁড়ি কলপ লাগানো কিন্তু দেখতে চমৎকার। ভ্রু যুগল ধনুকের মত বাঁকা। নয়নযুগল কিছুটা পীত বর্ণের কিন্তু আকর্ষণীয়। মোটকথা তিনি দেখতে অত্যন্ত সুপুরুষ। তাঁর উপর আমার দৃষ্টি পড়তেই আমার অন্তর থেকে ভীতি অন্তর্হিত হয়ে গেল। তিনি আমাকে তুর্কী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেনঃ

–আহমদ পাশার অবস্থা কেমন?

–তিনি ভাল আছেন।

–আপনি কি জানেন কেন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি?

–না।

আমার সাম্রাজ্যে আফগান ও তুর্কীরা ইরানীদের 'কাফের' বলে গালি দিয়ে থাকে। কুফর অত্যন্ত খারাপ জিনিস। আমি চাইনা যে, আমার সাম্রাজ্যে একদল আরেকদলকে 'কাফের' বলে গালি দিক। এখন থেকে আপনি আমার প্রতিনিধি

হিসেবে সাম্রাজ্য থেকে এসব কুফরী কথাবার্তার মূলোৎপাটন করবেন। শিয়া ইরানীদের আকীদা ও আমল আপনি পর্যবেক্ষণ করবেন। এ কাজ করতে গিয়ে আপনি যাকিছু দেখবেন ও শুনবেন তা আমাকে ও আহমদ পাশাকে অবহিত করবেন।

অতঃপর তিনি আমাকে বিদায় হবার অনুমতি দিলেন। অবশ্য এর আগে তিনি নির্দেশ প্রদান করলেন যেন, ই'তিমাদুদ্দৌলা আমার মেহমানদারীর যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং পরের দিন বাদ যোহর যেন আমি আলী আকবর মোল্লা বাশীর সংগে মিলিত হই।

অত্যন্ত খুশী ও আনন্দিত মনে আমি নাদির শাহের তাঁবু থেকে বের হয়ে আসলাম। রাজকীয় অতিথিশালায় এসে একটু বিশ্রাম নিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ই'তিমাদুদ্দৌলা তাঁর তাঁবুতে ফিরে আসলেন। এসেই তিনি আমাকে খাবারের জন্য আহবান জানালেন। আবদুল করিম বেগ, নজর আলী খান, আবু যর বেগ সকলেই আমার সেবায় নিয়োজিত ছিল।

ই'তিমাদের তাঁবুতে এসে তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বসেই সালামের জবাব দিলেন। এতে আমার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। সুযোগ পেলেই আমি তাঁকে আমার অসন্তোষের কথা প্রকাশ করব বলে ভেবে রাখলাম। কিন্তু আমি বসা মাত্রই তিনি সটান দাঁড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। তখন দেখলাম, তিনি একজন অত্যন্ত দীর্ঘদেহী মানুষ। গায়ের রং সাদা। বড় বড় চোখ। দাঁড়ি কলপ লাগানো। কিন্তু তাঁকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে হল। তিনি জানেন কিভাবে আলাপ–আলোচনা করতে হয়। তাঁর অনুভূতি প্রখর, মেজাজ নরম এবং তিনি আহলে সুন্নাহর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তাঁর দাঁড়ানোর পর বুঝতে পারলাম যে, মেহমানদের বসার পর দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানোই তাঁদের অভ্যাস। তাঁর নিকট দুপুরের খাবার গ্রহণ করার পর মোল্লা বাশীর সংগে সাক্ষাৎ করতে চললাম। রাজকীয় খাদেমরা আমার আগে আগে চলল।

পথিমধ্যে জনৈক দীর্ঘদেহী লোক আমার গতিরোধ করে দাঁড়ালেন। তিনি আমাকে সালাম করলেন ও স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। আমি প্রশ্ন করলামঃ

–আপনি কে?

–আমি মোল্লা হামযা, আফগানিস্তানের মুফতী।

–জনাব মোল্লা হামযা, আপনি কি আরবী জানেন?

–হাঁ।

--আমি বললাম, শাহ আমাকে ইরানীদের মধ্য থেকে কুফরীর বিষয়সমূহ দূরীকরণের নির্দেশ প্রদান করেছেন। হয়ত তারা এ বিষয়ে আমার সংগে বিবাদে অবতীর্ণ হবে অথবা অনেক কিছুই গোপন করবে। আমি তাদের অভ্যাস এবং ইবাদতের প্রথা–পদ্ধতি ভাল করে জানিনা। আপনি যদি তাদের মধ্যে প্রচলিত কুফরী সম্পর্কে অবহিত থাকেন তো আমাকে তা বলুন। যেন আমি তার মূলোৎপাটন করতেপারি।

তিনি বললেন, শাহের কথায় আপনি ধোকা খাবেননা। তিনি আপনাকে মোল্লা বাশীর নিকট এজন্যই পাঠিয়েছেন যেন, তিনি কথার মারপ্যাঁচে আপনাকে বিতর্কে জড়িয়ে ফেলেন এবং উদ্দেশ্য হাসিল করে নেন। তাই আপনি বিরত থাকুন। অগত্যা যদি বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণ করতেই চান তবে সব কিছুই করবেন অত্যন্ত সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার সংগে। কারণ,শাহ এ সভার কার্য পর্যবেক্ষণ করার জন্য একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করেছেন। এ পরিদর্শকের উপর নজর রাখার জন্যও আবার স্বতন্ত্র পরিদর্শক রেখেছেন। এমনকি তার উপর দৃষ্টি রাখার জন্যও অন্য লোক রয়েছে। কেউ কারো সম্পর্কে অবহিত নয়। সুতরাং শাহ যে করেই হোক প্রকৃত অবস্থা অবহিতহবেনই।

একটি বিতর্ক

মোল্লা বাশীর তাঁবুর নিকটে পৌছাতেই তিনি এগিয়ে এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং একটি উঁচু আসনে বসতে দিয়ে ছাত্রের মত তিনি নীচে বসে গেলেন। আমরা সাধারণ কথাবার্তায় লিপ্ত হলাম। এক সময় মোল্লা বাশী মোল্লা হামযাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

--আজ কি আপনি বুখারায় কাজী হাদী খাজা বাহরুল উলুমকে দেখতে পেয়েছেন?

--হাঁ,দেখেছিএকবার।

--কী করে তিনি নিজের জন্য বাহরুল উলুম উপাধি গ্রহণ করতে পারলেন, অথচ জ্ঞানের তিনি কিছুই জানেননা। আল্লাহর কসম, তাঁকে যদি হযরত আলীর খিলাফতের সমর্থনে দু'টো যুক্তিও পেশ করতে বলা হয়, তা–ও তিনি পারবেন না।

এমনকি আহলে সুন্নাহর শ্রেষ্ঠ আলেমগণও তা বলতে পারবেনা। কথাটার তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। আমাদের খোঁচা দেওয়াই হয়ত এর উদ্দেশ্য। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে প্রশ্ন করলামঃ

--কী সে যুক্তি যার কোন জবাব হয়না?

--আলোচনা লিপিবদ্ধ করার আগে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই। হযরত আলীর প্রতি রসূলুল্লাহর উক্তিঃ

انت منی بمنزلة هارون من موسٰی ، الا أنه لا نبی بعدی

(আমার নিকট তোমার স্থান মূসার নিকট হারুনের স্থানের অনুরূপ কিন্তু আমার পর কোন নবী নেই), আপনাদের নিকট প্রমাণিত কি?

--হ্যাঁ, এটাতো একটি প্রসিদ্ধ হাদীস।

--এ হাদীসটির শব্দ ও ভাব সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর ওফাতের পর খিলাফতের হকদার ছিলেন হযরত আলী।

--এ হাদীস দ্বারা কিভাবে একথা প্রমাণ করছেন?

--রসূলুল্লাহ (সঃ) এ হাদীসের মাধ্যমে আলীর প্রতি হারুন (আঃ)–এর সকল মর্যাদা অর্পণ করেছেন। একমাত্র নবুওয়ত ছাড়া আর কিছু বাদ রাখেননি। বিশেষভাবে নবুওয়তকে বাদ দেওয়াই বুঝায় যে, নবুওয়ত ব্যতীত হারুণের অন্যসব বৈশিষ্ট্য আলীর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং আলীর জন্য খিলাফত প্রমাণিত। কেননা, খিলাফত হারুনের অন্যতম মর্যাদা। তিনি বেঁচে থাকলে মূসা (আঃ)–এর ওফাতের পর খলীফা হতেন।

–আপনার কথা থেকে বুঝা যায় এটা যেন একটি 'সাধারণ সূত্র' এ সূত্রটি প্রমাণ করার পদ্ধতি কি?

–ইযাফত ইসতিগ্‌রাকের ফায়দা দেয় এবং নবুওয়তকে ইস্‌তিস্‌না করা থেকেও একথা বুঝা যায়।

আমি বললাম–এ হাদীসটি কোন 'নস–ই–জলী' নয়। কেননা, হাদীসটি নিয়ে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। কেউ বলেন, এটা 'সহীহ', কেউ বলেন 'হাসান', কেউ বলেন' যয়ীফ'–এমনকি ইবনুল জুযী জোর দিয়ে বলেছেন যে, হাদীসটি বানোয়াট। এ হাদীস দিয়ে কিভাবে আপনারা 'খিলাফত' প্রমাণ করছেন?

অথচ শরীয়তে কোন কিছু প্রমাণ করতে হলে আপনারা নস-ই-জলীর শর্ত আরোপ করে থাকেন?

মোল্লা বাশী বললেন-হাঁ তা করে থাকি বটে, তবে আমি বলতে চাই, এ হাদীস দ্বারা হযরত আলীর খিলাফত প্রমাণ করতে আপনাদের আপত্তি কোথায়?

আমি বললাম-এ হাদীসটি দলিল হবার যোগ্যতা রাখেনা। কারণ, ইসতিগ্রাক এখানে নিষেধ। হারুন (আঃ)-এর অন্যতম মর্যাদা এই ছিল যে,তিনি মূসা (আঃ)-এর সাথে নবী ছিলেন। আলী (রাঃ) আপনাদের ও আমাদের কারো মতেই নবী ছিলেন না-রসূলুল্লাহর জীবদ্দশায় নয়, ওফাতের পরও নয়। নবীর পর নবুওয়ত প্রাপ্তি ছাড়া হারুণের অন্য সকল মর্যাদা যদি হযরত আলীর প্রাপ্য হতো তবে নবীর সংগে নবী হওয়াটা আলীর জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। কেননা, নবীর সংগে নবী হওয়াটাকে বাদ দেওয়া হয়নি এবং হারুন নবীর সংগে নবী ছিলেন। রসূলুল্লাহ তো এ হাদীসে তাঁর ওফাতের পর কারো নবী হবার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছেন। এ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়না যে, তাঁর সংগে কেউ নবী ছিলেন না। অথচ আমরা সকলে একমত যে, নবুওয়তে তাঁর সঙ্গে কেউ শরীক ছিলেন না।

দ্বিতীয়তঃ, মূসা (আঃ)-এর ভাই হওয়াটাও হারুনের মর্যাদার অন্তর্ভূক্ত। হযরত আলী তো নবীর ভাই ছিলেন না। আম যখন ইস্তিস্না ছাড়াই কোন কারণে খাস হয়ে যায়, তখন তার দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে কোন কিছু করা যায় না। এমতাবস্থায় আলোচ্য উক্তি দ্বারা কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট একটি জিনিসই বুঝানো যেতে পারে। হাদীসটিতে منزلة "শব্দের "ة" হরফটি প্রমাণ করে এটা একবচন। ইযাফত তখন 'আহ্দ্' বুঝাবে, 'ইসতিগরাক' নয়। এটিই নিয়ম। তাছাড়া এ হাদীসে " لاّ " শব্দটি لكنّ এর অর্থ প্রদান করবে। যেমন বলা হয়

فلان جواد الا انه جبان

(অমুক ভাল ঘোড়সওয়ার কিন্তু সে কাপুরুষ)। সুতরাং প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য অনির্দিষ্ট হয়ে গেল, অবশ্য আমরা এটিকে নির্দিষ্ট করতে পারছি অন্য একটি কারণে। সে কারণটি হচ্ছে হারুনকে মূসার বনী ইসরাইলদের মধ্যে আপন প্রতিনিধি মনোনীত করার ঘটনা। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণীঃ اخلفني في قومي

(আমার কওমের মধ্যে আমাকে প্রতিনিধি বানিয়ে যাও)। অর্থাৎ মূসা (আঃ) যখন তূর পাহাড়ে আল্লাহর নিকট থেকে তওরাত আনার জন্য গিয়েছিলেন তখন তার ভাই হারুনকে বনী ইসরাইলের মধ্যে আপন প্রতিনিধি মনোনীত করে গিয়েছিলেন। তেমনিভাবে রসূলুল্লাহ (সঃ) তবুক যুদ্ধে যাবার সময় হযরত আলীকে মদীনায় তাঁর প্রতিনিধি মনোনীত করে গিয়েছিলেন। সুতরাং দেখা যায় যে, নবীর সাময়িক

অনুপস্থিতিতে হারুন এবং আলীর একটা নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার কথাই এ হাদীসে বলা হয়েছে।

মোল্লা বাশী বললেন– মদীনায় আলীকে রসূলুল্লাহর প্রতিনিধি করা থেকেই বুঝা যায় যে, উম্মতের মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম এবং ওফাতের পর তিনি খলীফা হবেন।

আমি বললাম–যদি তাই হয় তবে তো রসূলের ওফাতের পর ইবনে উম্মে মকতুমেরও খলীফা হবার কথা। কারণ, নবী তাঁকেও মদীনায় প্রতিনিধি মনোনীত করেছিলেন। বরং তাঁকে ছাড়া অন্যদেরও নবী এ মর্যাদা প্রদান করেছিলেন। একাধিক সাহাবীকে সেখানে নবী বিভিন্ন সময়ে মদীনায় আপনার প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন সেখানে আপনারা খিলাফতের জন্য কেবল হযরত আলীকে কেন বিশেষিত করলেন? তাছাড়া প্রতিনিধি হওয়াটা যদি এতই মর্যাদার বিষয় হতো তাহলে হযরত আলী সে মুহূর্তে রসূলুল্লাহকে কখনো এ কথা বলতেন না যে, "আপনি কি আমাকে নারী, শিশু ও দুর্বল লোকদের সংগে রেখে যেতে চান?" তাঁর একথার উত্তরে তাঁকে খুশী করার জন্য নবী (সঃ) বলেছিলেন, "তুমি কি এতে রাজী নও যে আমার নিকট তোমার স্থান হবে মূসার নিকট হারুণের মতো ?"

তিনি বললেন–আমার কাছে আরেকটি দলিল আছে যা ব্যাখ্যা ছাড়াই আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। সেটি হচ্ছে আল্লাহর বাণীঃ

قل تعالوا ندع أبناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين

"হে মুহাম্মদ আপনি বলে দিন–এসো আমরা আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তানদের, আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের নিয়ে আসি এবং আমরা তোমরা সকলেই উপস্থিত হই, অতঃপর এ দোয়া করি যে, যারা মিথ্যাচারী তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক"। (আলে ইমরান, আয়াত ৬১)।

আমি বললাম–এ আয়াত দ্বারা কিভাবে হযরত আলীর খিলাফত প্রমাণ করা যায়? তিনি বললেন–নাজরানের নাসারারা যখন মুবাহালার জন্য মদীনায় আসল, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হুসাইনকে কোলে তুলে নিলেন, হযরত হাসানের হাত ধরলেন এবং হযরত ফাতিমা ও হযরত আলীকে সংগে নিয়ে মুবাহালায় অংশ গ্রহণের জন্য বের হয়ে পড়েন। বলা বাহুল্য, শ্রেষ্ঠ মনে করার কারণেই তিনি এঁদেরকে সংগে নিয়েছিলেন দোয়ার জন্য।

আমি বললাম–এটা তাঁদের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের জন্য, শ্রেষ্ঠত্বের কারণে নয়। প্রত্যেক সাহাবীই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। একজন সাহাবীর মধ্যে বিদ্যমান গুণাবলী হয়ত অন্যজনের মধ্যে ছিলনা। দ্বিতীয়তঃ এঁরা রসূলুল্লাহর বংশধর ও পরিবারের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন বলেই মুবাহালায় তিনি এঁদের নিয়ে যান। স্বজনদের নিয়েই মুবাহালায় অংশ গ্রহণ করতে হয়। এঘটনার দ্বারা আজ পর্যন্ত কেউ একথা প্রমাণ করতে চাননি যে, সকল সাহাবীর মধ্যে এঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তৃতীয়তঃ আপনজনদের নিয়ে দোয়া করলে মনে নম্রতা বেশী আসে এবং ফলে তাড়াতাড়ি দোয়া কবুল হয়।

তিনি বললেন–তাইলে একথা প্রমাণিত হল যে, অধিক মহব্বত থেকে খুশু' খুযু' জন্ম নেয়। আমরা তো একথাই বলতে চাই যে, এঁদের প্রতি রসূলুল্লাহর বেশী মহব্বত ছিল বলেই তিনি তাঁদের সংগে নিয়েছিলেন।

আমি বললাম– এ মহব্বতের উৎস মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি। তাই দেখা যায়, একজন মানুষ তার নিজেকে ও নিজ সন্তানকে সেই ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসে যিনি তার ও তার সন্তানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ও উত্তম।

তিনি বললেন– এ আয়াতের মধ্যে এমন একটি দিকও রয়েছে যদ্বারা আলীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যায়। আয়াতে আলীকে রসূলুল্লাহর মধ্যে শামিল করা হয়েছে। 'আবনাআনা' বলে বুঝানো হয়েছে হাসান ও হুসাইনকে, 'নিসাআনা' বলে ফাতিমাকে এবং 'আনফুসানা' বলে নবী (সঃ) ও আলীকে।

আমি বললাম–দেখা যাচ্ছে আপনি না বুঝেন দ্বীনের মূলনীতিসমূহ না আরবী ভাষা। আয়াতে তো বলা হয়েছে 'আনফুসানা' এবং 'আনফুস' হল জম–ই–কিল্লত যার ইযাফত হয়েছে 'না'–এর দিকে সেটিও বহুবচন। প্রতি বহুবচনের ইযাফত হলে তার অর্থ হয় এককসমূহের বিভক্তিকরণ। যেমন আমরা বলে থাকি, 'রাকিবাল কাউমু দাওয়াব্বাহুম' (দল তাদের ঘোড়ায় আরোহণ করেছে) অর্থাৎ দলের প্রত্যেকে তার ঘোড়ায় আরোহণ করেছে। উসূলে ফিক্‌হ্ ও আরবী ব্যাকরণের গ্রন্থসমূহে বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আমি এখানে সেসবের অবতারণা করতে চাইনা। আরো বলা যায়, আয়াতটি যদি আলী মুর্তযার খিলাফত প্রমাণকারী হয় তবে এটা হাসান, হুসাইন ও ফাতিমার খিলাফতের প্রমাণকারী হবেনা কেন? অথচ এটা অবাস্তব। কেননা হাসান ও হুসাইন তখন নাবালক ছিলেন এবং ফাতিমা তো নারী হবার কারণে খলীফা হতেই পারেন না। তাই বুঝা যায়, আয়াতটি আদৌ খিলাফতের অর্থ প্রকাশ করেনা।

অতপরঃ এ প্রসংগে তাঁর কাছে যখন আর কিছুই বলার রইলনা তখন তিনি বললেন–আমার নিকট আরো একটি দলিল আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون -

অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধু হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং সেইসব ঈমানদার লোক যাঁরা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় ও আল্লাহর সামনে মাথা নত করে, (মায়েদা, ৫৫)। মুফাস্‌সিরগণ একমত যে, আয়াতটি হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। নামাযে থাকা অবস্থায় একজন ভিক্ষুক তাঁর নিকট ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে বিমুখ না করে আপন হস্তস্থিত আংটি দান করার পর আয়াতটি নাযিল হয়। এ আয়াতে ঈমানদার বলে আলীকে বুঝানো হয়েছে।

আমি বললাম–এ আয়াতের আমার কাছে অনেকগুলো জবাব রয়েছে। জবাবগুলো আমি একে একে উল্লেখ করতে যাচ্ছি এমন সময় উপস্থিত শিয়া আলেমদের মধ্য থেকে জনৈক আলেম মোল্লা বাশীকে লক্ষ্য করে ফারসীতে বললেন, "এ লোকটির সাথে আর তর্কে জড়াবেন না। লোকটি একটি মূর্তিমান শয়তান। যতই আপনি কথা বাড়াবেন সে তার একাধিক জবাব দিয়ে দিবে। এতে করে আপনার মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে।"

এরপর তিনি আমার দিকে ফিরে হেসে বললেন–আপনি সত্যিই একজন বিজ্ঞ লোক। আমার সব কথারই আপনার নিকট জবাব রয়েছে। কিন্তু আমার চ্যালেঞ্জ হল বাহরুল উলুমের প্রতি। তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না।

আমি বললাম–আপনার সকল প্রশ্নের জবাব আমার কাছে রয়েছে বলেই আমি আপনার সংগে তর্কে প্রবৃত্ত হইনি। বরং আলোচনার শুরুতেই যে আপনি অহেতুক আহলে সুন্নাহর আলেমদের চ্যালেঞ্জ করে বসলেন সেজন্য আমি কথাগুলো বললাম।

তিনি বললেন–আমি অনারব বিধায় আরবী ভাষা ভাল জানিনা, তাই এমন কিছু বলে বসাও আমার পক্ষে বিচিত্র নয় যেটা বলা হয়ত আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

অতপরঃ আমি বললাম–আমি আপনাকে এখন দু'টো প্রশ্ন করতে চাই। আমার বিশ্বাস শিয়া আলেমদের পক্ষে প্রশ্ন দু'টোর জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

–কী সে প্রশ্ন দু'টো?

–সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে শিয়াদের মত কি?

–আলী বিন আবু তালিবের হাতে বায়আত না করার দরুণ পাঁচজন ব্যতীত আর সকল সাহাবীই মুরতাদ হয়ে গেছে। এ পাঁচজন হলেন, আলী, মিকদাদ, আবু যর, সালমান ফারসী ও আম্মার ইবনে ইয়াসীর।

–ব্যাপারটি যদি এমনই হয়ে থাকতো তবে হযরত আলী কিভাবে আপন কন্যা উম্মে কুলসুমকে হযরত ওমরের সংগে বিয়ে দিলেন?

–এটা ছিল জবরদস্তিমূলক বিয়ে।

আমি বললাম–আল্লাহর কসম, আরব শার্দুল মূর্তযা সম্পর্কে আপনারা এমন জঘন্য ও হীন ধারণা পোষণ করে রেখেছেন যা আরবদের নিকৃষ্টতম ব্যক্তির কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়। হাশেমীয়দের পক্ষেতো, যাঁরা আরবদের নেতা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দিক থেকে শ্রেষ্ঠতম, বংশের দিক থেকে সর্বোত্তম, পৌরুষ ও বীর্যের দিক থেকে মহত্তম এবং বীরত্ব ও প্রসিদ্ধির দিক থেকে শীর্ষস্থানীয়–একথা মেনে নেয়ার প্রশ্নই উঠেনা। একজন সাধারণ আরবও যেখানে তার ইজ্জত, তার পরিবারের মান–সম্মানের জন্য অকাতরে জীবন দান করতে পারে সেখানে কী করে আপনারা আলীর মত নির্ভীক বীর, আরবদের শক্তির প্রতীক ও আল্লাহর সিংহের প্রতি এধরনের ঘৃণ্য ধারণা পোষণ করতে পারেন? দুর্বলতম আরবকেও কি কখনো অনুরূপ মত প্রকাশ করতে আপনারা দেখেছেন? আরবরাতো তাদের নারীদের মর্যাদার জন্য মৃত্যু বরণ করতে গৌরব বোধ করে।

মোল্লা বাশী বললেন–এমনও তো হতে পারে যে, তিনি প্রকৃত উম্মে কুলসুম ছিলেন না, বরং কোন জ্বিন উম্মে কুলসুমের আকৃতি ধারণ করে এবং তাকেই বিয়ে দেওয়া হয়।

আমি বললাম–এটি প্রথমটি থেকেও ঘৃণ্যতর, অযৌক্তিক ও অবিশ্বাস্য। কিভাবে আমরা এরূপ কল্পনা করতে পারি? একবার যদি আমরা এ পথ খুলে দিই তবে শরীয়ত ও ধর্মকর্মের সব দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এমন কি স্বামী যদি আপন স্ত্রীর নিকটবর্তী হয় তবে সে একথা বলে তাকে বাধা দিতে পারবে যে, "তুমি একটি জ্বিন। আমার স্বামীর আকৃতি ধারণ করে আমাকে ভোগ করতে এসেছ। আমার নিকট থেকে তুমি দূর হও, "কোন জালেম হত্যাকারী আদালতে একথা বলে নিজের অপরাধ অস্বীকার করতে পারবে যে, "আমি তো সে ব্যক্তিকে হত্যা করিনি, কোন জ্বিন হয় ত আমার রূপ ধরে এসে তাকে হত্যা করেছে।" কোন লোক কারো নিকট থেকে টাকা ধার নিয়ে একথা বলতে পারবে যে, "আমি তো ধার নিইনি, হয়ত জ্বিন আমার আকৃতি ধারণ করে একাজ করেছে।" কেউ এমন দাবীও করে বসতে পারে

যে, যে জাফর সাদেককে আপনারা ইমাম মানেন তিনি আসলে একটি জ্বিন ছিলেন–মানুষ ছিলেন না। এভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হতেপারে।

এরপর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম–অত্যাচারী শাসকের নির্দেশাবলী ও কার্যাবলী সম্পর্কে আপনাদের মত কী? এগুলো কি শিয়াদের নিকট কার্যকরী?

তিনি বললেন–কখ্খনো নয়। অত্যাচারী শাসকের নির্দেশ ও কার্য অবৈধ ও অকার্যকর। আমি বললাম–আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, বলুনতো মুহাম্মদ বিন হানফিয়া বিন আলী বিন আবু তালেব–এর মা কোন গোত্রের?

তিনি বললেন–বনী হানফিয়া গোত্রের।

আমি বললাম–নাকি বনী হানফিয়ার বন্দিনী?

পরাজয় এড়াবার জন্য মিথ্যা করে বললেন–আমি জানি না।

আমি বললাম–এ আলোচনায় আমি আপনাদের উপস্থাপিত যুক্তি দ্বারাই আপনাদের সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করলাম। আমাদের মতের সমর্থনে আমি কোন আয়াত বা হাদীসই পেশ করলামনা। কারণ, আমি যতই বলতাম যে, হাদীসটি সহীহ এবং সিহাহ সিত্তায় তা গৃহীত হয়েছে, আপনি বলতেন যে, "আমি এটিকে সহীহ বলে মানিনা। আর দলিলের শর্ত হচ্ছে উভয় পক্ষের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হতে হবে।" আমি যদি কোন আয়াত পেশ করে বলতাম যে, মুফাসসিরগণ সর্বসম্মতভাবে এ আয়াতের এ অর্থ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে এটা আবু বকর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, আপনি বলতেন যে, "মুফাসিরগণের সর্বসম্মত অভিমতের সাথে একমত পোষণ করা জরুরী নয়, আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা এই এবং এটিই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য।" তাই আমি আমার তরফ থেকে কোন আয়াত বা হাদীস পেশ করিনি।

অতঃপর শাহকে আলোচনায় যেসব কথাবার্তা হয়েছে সবই অবহিত করা হল। শাহ নির্দেশ দিলেন যেন, ইরান, আফগানিস্তান ও মাওরাউন্নহর–এর উলামায়ে কেরাম একটি সভায় একত্রিত হয়ে শেষোক্ত দল দু'টো কর্তৃক ইরানীদের কাফের বলার কারণ অনুসন্ধান করেন এবং ইরানীদের মধ্যে সত্যিই যদি কুফরী কিছু থেকে থাকে তবে তা দূরীভূত করতে চেষ্টা করেন। যাতে করে একে অপরকে কাফের বলার প্রবণতা থেকে সকলেই মুক্ত হয়। শাহ আমাকে এ সভায় তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন এবং নির্দেশ দিলেন আমি যেন সব কিছু অবলোকন করিও পক্ষত্রয়ের উপর সাক্ষীহই।

এরপর আমরা তাঁবু থেকে বের হয়ে আসলাম। আফগান, উজবেক ও ইরানী সকলেই আমার সুদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমাকে উষ্ণ বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। দিনটি সত্যিই স্মরণীয় ছিল।

সম্মেলন

প্রথম দিন

হযরত আলী (রাঃ)-এর সমাধির পেছনের খোলা ছাদের নীচে ইরান থেকে আগত উলামায়ে কেরাম স্থান গ্রহণ করলেন। তাঁদের সংখ্যা প্রায় সত্তর। এঁদের মধ্যে একমাত্র আরদালানের (পশ্চিম ইরানের একটি প্রদেশ) মুফতী ছাড়া আর সকলেই শিয়া। আমি দোয়াত ও কাগজ আনিয়ে তাঁদের প্রসিদ্ধ আলেমদের নাম লিপিবদ্ধ করে নিলাম। এঁরা হলেনঃ

১। মোল্লা বাশী আকবর-শিয়া আলেমদের প্রধান

২। আগা হুসাইন-রিকাবের মুফতী

৩। মোল্লা মোহাম্মদ- লাহজানের ইমাম

৪। আগা শরীফ-মাশহাদ-ই-রেজার মুফতী

৫। মীর্জা বুরহান-শিরওয়ানের কাযী

৬। শাইখ হুসাইন-উরমিয়ার মুফতী

৭। মীর্জা আবুল ফজল-কুমের মুফতী

৮। আলহাজ্ব সাদেক-জামের মুফতি

৯। সাইয়েদ মুহাম্মদ মাহদী-ইস্পাহানের ইমাম

১০। আলহাজ্ব মুহাম্মদ জাকী-কিরমানশাহের মুফতী

১১। আলহাজ্ব মুহাম্মদ সামামী-শীরাজের মুফতী

১২। মীর্জা আসাদুল্লাহ-তবরীজের মুফতী

১৩। মোল্লা তালিব-মাযিন্দরানের মুফতী

১৪। মোল্লা মুহাম্মদ মাহদী-মাশহাদ-ই-রেজার সহ-সভাপতি

১৫। মোল্লা মুহাম্মদ সাদেক-খালখালের মুফতী

১৬। মুহাম্মদ মুমিন-আসতরাবাদের মুফতী

১৭ সাইয়েদ মুহাম্মদ তকী-কাযবীনের মুফতী

১৮। মোল্লা মুহাম্মদ হুসাইন–সাবযাবারের মুফতী

১৯। সাইয়েদ বাহাউদ্দীন–কিরমানের মুফতী

২০। সাইয়েদ আহমদ–আবদালানের শাফেয়ী মুফতী

এরপর আগমন করলেন আফগানিস্তানের উলামায়ে কেরাম। তাঁরা হলেনঃ

১। শাইখ মোল্লা হামযা কালানজানী হানাফী–আফগানিস্তানের মুফতী

২। মোল্লা আমীন বিন সুলায়মান–আফগানিস্তানের কাযী

৩। মোল্লা তোয়াহা আফগানী হানাফী

৪। মোল্লা দুনিয়া খালফী হানাফী

৫। মোল্লা নূর মুহাম্মদ আফগানী হানাফী

৬। মোল্লা আবদুর রাজ্জাক আফগানী হানাফী

৭। মোল্লা ইদরীস আবদালী হানাফী

অতঃপর সভামঞ্চে আসলেন মাঅরাউন্নহর–এর উলামায়ে কেরাম। সংখ্যায় তাঁরা সাতজন। তাঁরা হলেনঃ

১। আল্লামা হাদী খাজা বাহরুল উলুম বিন আলাউদ্দিন বুখারী–বুখারার হানাফী কাযী

২। মীর আবদুল্লাহ বুখারী হানাফী

৩। কলন্দর খাজা বুখারী হানাফী

৪। মোল্লা আমীদ বুখারী হানাফী

৫। বাদশাহ মীর খাজা বুখারী হানাফী

৬। মীর্জা খাজা বুখারী হানাফী

৭। মোল্লা ইব্রাহীম বুখারী হানাফী

আমার উভয় দিকে আমাকে ঘিরে বসলেন শিয়া উলামায়ে কেরাম। আমার দিকে একটু দূরে বসলেন মাঅরাউন্নহরের উলামা এবং বাম দিকে একটু দূরে আফগান উলামায়ে কেরাম। ইরানী আলেমগণ ইচ্ছা করেই আমাকে অন্যান্য সুন্নী আলেমদের নিকট থেকে দূরে রাখলেন যেন আমি তাঁদের কোনকিছু বলে দিতে না পারি। যাইহোক, সকলেই যখন আপন আপন স্থানে ঠিকমত বসলেন, ে মাল্লা বাশী আমার
দিকে ইশারা করে বাহরুল উলুমকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

–আপনি কি এ লোকটিকে চেনেন?

তিনিবললেন–'না'।

তখন মোল্লা বাশী বললেন–ইনি আহলে সুন্নাহর শ্রেষ্ঠ আলেম–ফাযেলদের অন্যতম। তাঁর নাম শাইখ আবদুল্লাহ আফেন্দী (শিয়াদের কাছে আমি এ নামেই পরিচিত ছিলাম)। শাহ তাঁকে ওযীর আহমদ পাশার নিকট থেকে আনিয়েছেন আজকের এ বিতর্ক–সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য। এ সভায় তিনি শাহের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে নিরপেক্ষ বিচারক। এখন আপনারা বলুন, কেন আপনারা আমাদের কাফের বলে থাকেন, যেন আমরা এঁর উপস্থিতিতে তা খন্ডন করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে আবু হানিফার নিকট আমরা কাফের নই। জামিউল উসূলে তিনি ইসলামের পাঁচটি মযহাবের মধ্যে ইমামিয়াকে একটি মযহাব হিসাবে গণ্য করেছেন। এমনিভাবে 'আল–মাওয়াকিফ'–এর লেখকও ইমামিয়াকে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত রেখেছেন। 'আল–ফিকহুল আকবার'–এ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, "আমরা আহলে কিবলাকে কাফের বলিনা।" প্রকৃতপক্ষে ইমামিয়া ইসলামের প্রসিদ্ধ মযহাবসমূহের একটি। কিন্তু পরবর্তীকালের সুন্নী আলেমরা আমাদের কাফের বলেছেন, যেমন পরবর্তীকালের শিয়া আলেমগণ আপনাদের কাফের বলেছেন। আসলে আমরা ও আপনারা কেউ কাফের নই। এখন বলুন, কী কারণে আপনাদের পরবর্তীকালের আলেমগণ আমাদের কাফের বলেছেন, আমরা তা খন্ডন করব।

বাহরুল উলুম বললেন–শায়খায়নকে (আবু বকর ও ওমর) গালি দেওয়ার কারণে আপনারা কাফের।

–শায়খায়নকে গালি দেওয়া আমরা পরিহার করলাম।

–সাহাবায়ে কেরামকে গুমরাহ ও কাফের বলার কারণে আপনারা কাফের হয়ে যাচ্ছেন।

-স্বীকার করে নিলাম, সাহাবায়ে কেরাম সকলেই ন্যায়ানুসারী।

-আপনারা মুতআকে হালাল মনে করেন। (১)

-আমরা মুতআকে হারাম মনে করি। আমাদের মধ্যে মূর্খরা ব্যতীত অন্য কেউ এটিকে জায়েয মনে করেনা।

-আপনারা আলীকে আবু বকরের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এবং দাবী করেন যে, রসূলুল্লাহর ওফাতের পর আলীই প্রকৃত খলীফা ছিলেন।

-নবীর পর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম মানুষ আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা, তারপর ওমর বিন খাত্তাব, তারপর ওসমান বিন আফ্ফান, তারপর আলী বিন আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুম। আমরা একথাও স্বীকার করছি যে, তাঁদের খিলাফতের ক্রমধারাও অনুরূপ।

-তবে আপনাদের মূলনীতি ও আকীদা কী?

-আমরা আবুল হাসান আশয়াবীর আকিদায় বিশ্বাসী।

বাহরুল উলুম বললেন-ঐক্যের জন্য আমি এ শর্ত আরোপ করতে চাই যে, ধর্মে সর্বসম্মতিক্রমে যেসব জিনিষকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে সেগুলোকে হালাল এবং যেসব জিনিষকে সর্বসম্মতিক্রমে হালাল সাব্যস্ত করা হয়েছে সেগুলোকে হারাম জানবেন না।

মোল্লা বাশী বললেন-আমরা এ শর্ত মেনে নিলাম। ঐক্যের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন শর্ত মানতে আমরা রাজী আছি। আপনাদের প্রদত্ত সকল শর্তই যখন আমরা

---

(১) মুতআ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে উপভোগ সম্ভোগ। শিয়াদের নিকট মুতআর মানে হচ্ছে কোন পুরুষের কোন স্বামীহীনা গায়ের মহরম নারীর সাথে এই মর্মে চুক্তিতে উপনীত হওয়া যে, সে তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ভোগ করবে। নারীটি যদি এ প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয় তবেই মুতআর চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায়। তবে এর শর্ত হচ্ছে, সময়কাল নির্দিষ্ট হওয়া, অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া এবং চুক্তিতে মুতআ শব্দটি ব্যবহার করা। এতে সাক্ষী, উকীল, কাযী, চুক্তিপত্র লেখা কোনকিছুরই প্রয়োজন পড়েনা। সব কিছুই গোপনেও হতে পারে এবং নির্দিষ্ট সময়কালের ভিতরে উভয়ে সহবাস ও সংগম করতে পারে। নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গেলে মুতআও শেষ হয়ে যায়। শিয়াদের মতে খুব অল্প সময়ের জন্যও মুতআ করা যায়। দু'এক দিন এমনকি দু'এক ঘন্টার জন্যও মুতআ হতে পারে। দেহপসারিণী এবং পেশাদার বেশ্যাদের সাথেও মুতআ করা যায়। দ্বাদশ ইমামপন্থী শিয়া মযহাবে মুতআ কেবল জায়েয ও হালালই নয় বরং এটা একটি ইবাদত। এর পুরস্কার নামায, রোযা ও হজ্জের চেয়েও বেশী। শিয়াদের প্রমাণ্য তফসীর গ্রন্থ 'মানহাজুস সাদিকীন'-একটি রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি একবার মুতআ করে সে ইমাম হাসানের, দু'বার করে সে ইমাম হুসাইনের, যে তিনবার করে সে আমীরুল মুমিনীন আলী (রাঃ)-এর মর্তবা পাবে এবং যে চারবার করে সে আমার (রসূলের) মর্তবা পাবে। (নাউযুবিল্লাহ)। মুতআর প্রশংসা ফযীলত বর্ণনা এবং মুতআর প্রতি উৎসাহিত করা সংক্রান্ত রিওয়ায়েতে শিয়া গ্রন্থসমূহ ভরপুর।

মেনে নিলাম তখন আমাদের মযহাবকে ইসলামী মযহাব হিসেবে মেনে নিতে আর বাধা কোথায়?

বাহরুল উলুম কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন–শায়খায়নকে গালি দেওয়া কুফরী।

মোল্লা বাশী বললেন–শায়খায়নকে গালি দেওয়াসহ আপনাদের নিকট আপত্তিকর সব কিছুই আমরা প্রত্যাহার করে নিলাম। এরপরও কি আপনারা আমাদের ইসলামী মযহাব হিসেবে মেনে নিবেন না?, এখনও কি আমাদের আপনারা কাফের মনে করেন?

বাহরুল উলুম কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললেন–শায়খায়নকে গালি দেওয়া কুফরী।

–আমরা কি এটি প্রত্যাহার করিনি?

মোল্লা হামজা তখন বললেন–জনাব হাদী খাজা, আপনার নিকট কি এমন কোন প্রমাণ রয়েছে যে, এ সভায় যারা অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁরা কখনো শায়খায়নকে গালি দিয়েছেন?

–না, তা নেই।

–এঁরা তো এখন আমাদের সামনে এ অংগীকার করছেন যে, ভবিষ্যতে কখনও এমনটি ঘটবেনা। তবে কেন আপনি তাঁদের ইসলামী ফিরকা হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছেন না?

বাহরুল উলুম বললেন–বিষয়টি যদি এমনই হয়ে থাকে তবে আমরা তাঁদের মুসলমান হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছি।

অতঃপর খুশী হয়ে সকলেই দাঁড়িয়ে গেলেন, পরস্পর করমর্দন করলেন এবং একে অপরকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। তিনটি দলই আমাকে যাকিছু ঘটেছে তার উপর সাক্ষী রাখলেন এবং সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা মেনে চলার অংগীকার ব্যক্ত করলেন।

২৪শে শওয়াল বুধবার সন্ধ্যার পূর্বে সভার সমাপ্তি ঘোষিত হল। আমি দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, সভায় অনারবদের সংখ্যাই হবে দশ হাজারের অধিক।

সন্ধ্যার চার ঘন্টা পর ই'তিমাদুদ্দৌলা এসে বললেন–শাহ আপনাকে আপনার

সুকৃতির জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি আপনার নিকট সালাম পাঠিয়েছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে, আগামী কাল আপনি একই স্থানে তাঁদের সংগে মিলিত হবেন। আমি তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছি, এ পর্যন্ত যেসব বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, সেগুলো যেন একটি কাগজে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বাক্ষরের নীচে যেন স্ব স্ব সীল প্রদান করেন। আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনি উক্ত কাগজের উপর আপনার স্বাক্ষর ও সীল প্রদান করবেন এবং একথা লিখে দিবেন যে, গোটা সভার কার্যক্রম আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং যেসব বিষয়ে ফিরকাত্রয় ঐক্য মতে পৌছেছে সেগুলো আপনার সম্মুখেই হয়েছে।

আমি বললাম–তাই হবে ইনশা'ল্লাহ্।

সম্মেলনঃ দ্বিতীয় দিন

২৫শে শওয়াল, ১১৫৬হিজরী বৃহস্পতিবার দুপুরের আগেই নির্দেশ আসল, আমরা সকলেই যেন আবার পূর্বের স্থানেই একত্রিত হই। সেখানে গিয়ে দেখি বিরাট ব্যাপার। সমাধিস্থলের বাইরে অনারবদের প্রচন্ড ভিড়। সংখ্যায় তারা প্রায় ৬০লাখ। আসন গ্রহণ করার পর সাত হাতেরও অধিক লম্বা একটি কাগজ আমাদের সামনে নিয়ে আসা হল। কাগজটির দুই–তৃতীয়াংশ ঘনভাবে লিখিত এবং নীচের অংশটি সমান চার ভাগে বিভক্ত, কোন কোন অংশ লিখিত আবার কোন কোন অংশ সাদা। মোল্লা বাশী একসময় মুফতী আগা হুসাইনকে নির্দেশ দিলেন, দাঁড়িয়ে কাগজটি সবাইকে পড়ে শুনাতে। অত্যন্ত দীর্ঘদেহী এ মুফতী ফারসী ভাষায় লিখিত কাগজটি হাতে নিলেন এবং উচ্চস্বরে পড়তে লাগলেন। এর বিষয়বস্তু নিম্নরূপঃ

পৃথিবীতে নবী–রসূল পাঠানো আল্লাহর প্রজ্ঞার একটি বিশেষ দিক। একের পর এক রসূল পাঠিয়ে তিনি সর্বশেষে পাঠালেন আমাদের নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)কে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)–এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম ও সবচাইতে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আবু বকর ইবনে কুহাফা (রাঃ)কে সর্বসম্মতিক্রমে রসূলের খলীফা নির্বাচিত করেন এবং তাঁর হাতে বয়আত করেন। তাঁর হাতে যাঁরা বয়আত করেন তাঁদের মধ্যে হযরত আলী বিন আবু তালিবও ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে ও সাগ্রহে বয়আতে অংশ নেন। মদীনায় উপস্থিত সাতশত সাহাবীর সকলেই আবু বকর সিদ্দীকের বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি যে খলীফায়ে হক ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের ইজমা'ই তার অকাট্য প্রমাণ। কুরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করেছেন। যেমন একস্থানে বলেছেনঃ والسّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار, অন্য একস্থানে বলেছেনঃ,

لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة۔

অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক মৃত্যুর পূর্বে খিলাফতের জন্য হযরত ওমর বিন খাত্তাবের নাম প্রস্তাব করেন। হযরত আলী (রাঃ) সহ সকল সাহাবী সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে খলীফা হিসেবে মেনে নেন এবং তাঁর হাতে বয়আত করেন।

হযরত ওমর বিন খাত্তাবের পর সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে হযরত ওসমান বিন আফ্ফানকে খলীফা নির্বাচিত করেন। হযরত ওসমানের শাহাদতের পর সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আলী (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হন।

ইসলামের প্রথম চারজন খলীফা একই শহরের অধিবাসী এবং সমসাময়িক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোন বিরোধ, বিবাদ ও ঝগড়া ছিলনা। তাঁদের প্রত্যেকেই একে অপরকে ভালবাসতেন, সহযোগিতা করতেন ও প্রশংসা করতেন। হযরত আলী (রাঃ) একবার শায়খায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেনঃ "তাঁরা সত্যানুসারী ন্যায়পরায়ণ ইমাম, সত্যের উপরে ছিলেন এবং সত্যের উপরই মৃত্যুবরণ করেন।" আবু বকরের নিকট যখন খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তখন তিনি বলেছিলেন "আপনারা আমার হাতে বয়আত করেছেন অথচ আপনাদের মধ্যে রয়েছেন আলী বিন আবু তালেব?"

সুতরাং ইরানীরা জেনে রাখ, তাঁদের মর্যাদা ও খিলাফতের ক্রমধারা সেভাবেই যেভাবে এখানে বর্ণিত হয়েছে। যারা তাঁদের কাউকে গালি দেবে তাদের সম্পদ, জীবন ও ইজ্জত শাহের জন্য হালাল হয়ে যাবে এবং তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশ্তা ও সকল মানুষের অভিশাপ।

১১৪৮ সনে বয়আতের সময় সাহাবীদের গালি দেওয়া থেকে সকলকে বিরত রাখার যে ওয়াদা তোমাদের দিয়েছিলাম আজকে আমি সেই ওয়াদা পূরণ করলাম। এরপর যে ব্যক্তি সাহাবাকে গালি দেবে আমি তাকে হত্যা করব, তার সন্তান ও পরিবার–পরিজনকে বন্দী করব এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করব।

অতীতে এক সময় ইরান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় এসব গালিগালাজ ও ঘৃণ্য জিনিষ ছিলনা। শাহ ইসমাইল সাফাঈ'র শাসনামলে সর্বপ্রথম ইরানে জঘন্য এ বিদআত চালু হয় এবং তা হয় সরকারী মদদ ও পৃষ্ঠপোষকতায়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধররা এ খারাপ প্রথাটি জিইয়ে রাখেন। ক্রমে ক্রমে এ বিদআত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। (১)

এছাড়াও কাগজে শাহ আরো অনেক কিছু বলেছেন যেগুলো অপ্রাসংগিক বিধায় এখানে উল্লেখ করা হলনা। পড়া শেষ করার পর মোল্লা বাশীকে আমি বললাম, বয়আতের সময় আবু বকর সিদ্দীক হযরত আলী প্রসংগে যা বলেছেন একথা আমাদের

---

(১) শাহ ইসমাইল ৮৯২হিঃ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং তরুণ বয়সেই তিনি অসাধারণ মেধা ও যোগ্যতার বলে সাফাভী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ৯১৫সনে তিনি বাগদাদ দখল করেন। ৯১৬সনে ইরানের ইতিহাসে প্রথমবারের মত তিনি শিয়াবাদকে ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা দেন। ৯২০সনে সুলতান সলীম এক প্রচন্ড যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত ও আহত করেন। শাহ ইসমাইল কোন রকমে জীবন নিয়ে পলায়ন করেন এবং এর দশ বছর পর ৯৩০সনে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ৩৮ বছরের জীবনে ২৪ বছরই তিনি অতিবাহিত করেন একজন শাসক হিসেবে। পিতার কবরের পাশে আব্দ্বিলে সমাধিস্থ করা হয়।

নিকট প্রমাণিত নয়। আবু বকর সত্যিই আলীর প্রশংসা করেছেন এবং আলীও শায়খায়নের প্রশংসা করেছেন কিন্তু এখানে যা বলা হয়েছে তা ঠিক নয়। বরং এটা বানোয়াট। কিন্তু আমার এ আপত্তি ও প্রতিবাদ তাঁরা গ্রহণ করেননি।

মূল অংশের পর ছোট লাইনে ইরানী ভাষায় ইরানীদের পক্ষ থেকে যে কথাগুলো লিখা হয়েছে তা এইঃ

"আমরা গালি দেওয়া পরিত্যাগ করার নীতি মেনে নিলাম। আরো মেনে নিলাম যে, সাহাবীদের মর্যাদা ও খিলাফতের ক্রমধারা তাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের যে কেহ এখন থেকে সাহাবায়ে কেরামকে গালি দেবে অথবা এ সিদ্ধান্তের বিপরীত কিছু বলবে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ। আমাদের সকলের উপর নাদির শাহের ক্রোধ এবং আমাদের সম্পদ, রক্ত ও সন্তান তাঁর জন্য হালাল।"

এরপর তাঁরা তাঁদের এ বক্তব্যের নীচের সাদা স্থানে নিজ নিজ স্বাক্ষর ও সীল প্রদান করলেন।

এর নীচেই ছোট লাইনে লেখা রয়েছে নজফ, কারবালা, হুলা ও খাওয়ারিজ–এর উলামায়ে কেরামের বক্তব্য যার বিষয়বস্তু হুবহু তাই যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে। নীচে রয়েছে তাঁদের স্বাক্ষর ও সীল। অতঃপর রয়েছে আফগান উলামাদের বক্তব্য যার বিষয়বস্তু নিম্নরূপঃ

"এ কাগজে ইরানীদের যে সিদ্ধান্ত ও অংগীকার ব্যক্ত হয়েছে তা যদি তাঁরা মেনে চলেন এবং এর বিপরীত কিছু তাঁদের নিকট থেকে প্রকাশিত না হয়, তবে তাঁরা ইসলামী মযহাবের অন্তর্ভূক্ত। মুসলমানদের যে দায়িত্ব ও অধিকার তাঁদেরও তা থাকবে।" এরপর তাঁদের নামের নীচের সাদা অংশে তাঁরা স্বাক্ষর ও সীল প্রদান করেন।

অতঃপর এ ফকীর কাগজের উপরিভাগে সীল–স্বাক্ষরসহ নিম্নলিখিত বাক্যটি লিখে দেয়।

তিন দল যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং যেসব অংগীকার ব্যক্ত করলেন, আমি তা প্রত্যক্ষ করলাম। তাঁরা আমাকে সম্মেলনের উপর সাক্ষী রেখেছেন।

সময়টি ছিল স্মরণীয় মুহূর্ত। মানব জাতির ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আহলে সুন্নাহর জন্য অভূতপূর্ব আনন্দ ও খুশীর দিন। অতীতে কোনও দিন এতো আনন্দ আদের ভাগ্যে জুটেনি। বিয়ের অথবা ঈদের আনন্দও এর কাছে কিছু ছিলনা। এ জন্য সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।

সম্মেলনের সমাপ্তির পর রূপার পাত্রে শাহ আমাদের জন্য প্রচুর মিষ্টান্ন পাঠালেন। তৎসংগে খাঁটি সোনার পাত্রে পাঠালেন মূল্যবান সুগন্ধি যার মধ্যে ছিল এক মুষ্টি পরিমাণ আম্বর। আমরা সুগন্ধি লাগালাম ও মিষ্টি খেলাম। তারপর আমরা সম্মেলনস্থল থেকে বের হয়ে আসলাম। সময়টি ছিল বৃহস্পতিবার বিকাল।

অতঃপর আমাকে আবার শাহের নিকট নিয়ে আসা হল। আমি পূর্বের মতই ছোট ছোট কদমে তাঁর নিকট যেতে লাগলাম। এবার তিনি আমাকে তাঁর সিংহাসনের আরো কাছে নিয়ে গেলেন। সম্মুখে দাঁড়ানোর পর তিনি বললেনঃ

জনাব আবদুল্লাহ আফেন্দী, আপনি মনে করবেননা যে, শাহানশাহ তাঁর এ কৃতিত্বের জন্য গর্ববোধ করেন। এটা আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে সাহাবাদের গালি দেওয়া থেকে লোকদের বিরত রাখার তৌফিক প্রদান করলেন। সুলতান সলীম থেকে আজ পর্যন্ত উসমানীয় সম্রাটরা এ উদ্দেশ্যে কত যুদ্ধ করলেন, কত সৈন্য, সম্পদ ও জীবন নষ্ট করলেন, কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হলনা। আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে দিয়ে এ কাজটি করালেন। এ খারাপ গালিগুলো খবীস শাহ ইসমাইলের শাসনামলে আমাদের সমাজে চালু হয়েছে এবং এ পর্যন্ত চলেছে।

আমি বললাম–এরপর আশা করি অনারবরা সকলেই ইনশাআল্লাহ পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জমায়াতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

তিনি বললেন–তা হবে ইনশাআল্লাহ, তবে ধীরে ধীরে। কিন্তু এজন্য আমি গর্ব করবনা। আমি যদি গর্ব করতাম তবে তা করতাম একারণে যে, আমি একই সংগে চার–চারটি সাম্রাজ্যের সুলতান–ইরান, তুর্কীস্থান, হিন্দুস্থান ও আফগানিস্থান। আমার উপর এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। মুসলমানদের উপর আমার সর্ববৃহৎ অবদান এইযে, আমি সাহাবায়ে কেরামকে গালি–গালাজ করার পথ বন্ধ করে দিয়েছি। আশা করি তাঁরা এজন্য আমার শাফায়াত করবেন।

জনাব আবদুল্লাহ আফেন্দী, আমি জানি যে, আহমদ পাশা আপনার প্রতীক্ষায় আছেন এবং আমিও আপনাকে তাঁর নিকট পাঠাতে চাই। কিন্তু আমার অনুরোধ আপনি আগামীকাল পর্যন্ত থেকে যান। আমি বলেছি কুফার মসজিদে আমরা জুমার নামায আদায় করব। আমি নির্দেশ দিয়েছি জুমার খুতবায় সাহাবাদের (খুলাফায়ে রাশেদীনের) নাম যেন ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হয়। আরো আদেশ দিয়েছি যেন, প্রথমে দোয়া করা হয় আমার বড় ভাই উসমানীয় সম্রাটের জন্য, তারপর আমার জন্য। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমার বড় ভাই এবং আমি তাঁর ছোট ভাই। ছোট ভাইয়ের উচিত বড় ভাইকে

শ্রদ্ধা করা। আমি স্বীকার করি যে, তিনি আমার চেয়ে বড়। কারণ, তিনি সুলতান বিন সুলতান আর আমার পিতা অথবা দাদা কেউ সুলতান ছিলেন না।

কথা শেষ হলে তিনি আমাকে যাবার অনুমতি দিলেন। বের হয়ে আসার সময় আমি শুনতে পেলাম প্রতিটি তাঁবুতেই অনারব সৈন্যদের কণ্ঠ থেকে নির্গত হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা ও গৌরব–গাঁথা। আল–কুরআনের আয়াত ও রসূলুল্লাহর হাদীসের আলোকে তারা উচ্চস্বরে প্রশস্তি গাইছে হযরত আবু বকর, ওমর ফারুক ও ওসমান যুন্নুরাইনের। তা–ও এমন উৎসাহ ও মহব্বতের সংগে যা আহলে সুন্নাহর মধ্যেও সচরাচর দৃষ্ট হয়না। এ মধুর দৃশ্য আমার মনকে আনন্দে উদ্বেলিত করে দিল। আমি ভেবেই পাচ্ছিলামনা কিভাবে শাহ ইসমাইল সাফাভী আজ থেকে তিন শ' বছর পূর্বে মুসলমাদের এ স্বর্গীয় পরিবেশকে কলুষিত করে যেতে পেরেছিল?

শুক্রবার সকালে শাহ কুফা রওনা হয়ে গেলেন। নজফ থেকে কুফার দুরত্ব তিন মাইলের কিছু বেশী। কুফা পৌছে দুপুরের পর পর শাহ তাঁর মুআয্যিনদের আযান দেবার নির্দেশ দিলেন এবং এও নির্দেশ দিলেন যেন সকলেই জুমআর নামাযে উপস্থিত হয়। আমাকেও মসজিদে হাজির হবার কথা বলা হল।

মসজিদে গিয়ে দেখি মানুষের ঢল। প্রায় পাঁচ হাজার লোক হাজির হয়েছেন নামাযে, তন্মধ্যে রয়েছেন ইরানের উলামা ও খানগণ। খুতবার জন্য ইমাম মিম্বরে আরোহন করলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর উপর দরূদ পাঠ করার পর বললেনঃ

وعلى الخليفة الاوّل من بعده على التحقيق ، ابى بكر الصّديق
رضى الله عنه ، وعلى الخليفة الثانى الناطق بالصدق والصّواب،
سيّدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعلى الخليفة الثالث جامع القرآن
عثمان بن عفّان رضى الله تعالىٰ عنه وعلى الخليفة الرابع ليث بنى
غالب سيدنا على بن ابى طالب ، وعلى ولديه الحسن والحسين
وعلى باقى الصحابة والقرابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين

সাহাবায়ে কেরামের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষণের জন্য উপরোক্ত দোয়া করে তিনি উসমানীয় শাসক সুলতান মাহমুদ খানের দোয়া করতে গিয়ে বললেনঃ

الله أدم دولة ظل الله في العالم سلطان سلاطين بني آدم

كيوان رفعته و مريخ جلادته ثاني اسكندر ذي القرنين ،

سلطان البرين وخاقان البحرين ، خادم الحرمين الشريفين

السلطان محمود خان بن السلطان مصطفى خان ، أيد الله خلافته

وخلد سلطانته ونصرجيوشه الموحدين على القوم الكافرين بحرمة الفاتحة

অতঃপর তিনি নাদির শাহের জন্য দোয়া করতে গিয়ে বললেনঃ

اللهم أدم دولة من أضاءت به الشجرة التركمانية قاب

الرياسة وجنكيز السياسة ، وملاذ السلاطين و ملجأ

الخواقين ظل الله في العالمين قرآن نادر دوران ـ

খুতবা শেষ করার পর মিম্বর থেকে অবতরণ করে নামাযের স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। যথারীতি ইকামতের পর নামায শুরু হল। প্রথম রাকআতে ইমাম সূরা ফাতেহার পর সূরা জুমআ পাঠ করলেন। রুকু'র আগে হাত উঠিয়ে জোরে দোয়া কূনূত পড়লেন। রুকু'তে গিয়ে জোরে তসবীহ পড়লেন। 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকু' থেকে মাথা উঠালেন–'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন না। সোজা দাঁড়ানো অবস্থায় আবার জোরে কূনূত পড়লেন। তারপর সিজদায় গিয়ে সাধারণ তসবীহ ছাড়াও জোরে জোরে আরো কিছু পড়লেন। সিজদাহ থেকে বসেও জোরে দোয়া পড়লেন। দ্বিতীয় সিজদায় গিয়েও প্রথমবারের মতই তাসবীহ ও দোয়া পড়লেন। দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে সূরা ফাতেহার পর সূরা মুনাফিকীন পাঠ করলেন এবং প্রথম 'রাকআতের মত রুকু'–সিজদাহ আদায় করলেন। তাশাহ্হুদের জন্য বসেও জোরে জোরে অনেক কিছু পড়লেন। অতঃপর কেবলমাত্র ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করলেন।

নামাযের পর শাহের তরফ থেকে প্রচুর মিষ্টি আসল। মিষ্টি বিতরণের সময় প্রচন্ড ভিড় ও হৈ চৈ শুরু হল। ভিড়ের চাপে মোল্লা বাশীর মাথা থেকে পাগড়ী পড়ে গেল। আমি এ অস্বাভাবিক ভিড়ের কারণ জানতে চাইলে বলা হল যে, বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে ভিড় ও ধাক্কাধাক্কি হলে তা দেখে শাহ্ খুশী হন বলেই এরা এমন করছে। তারপর আমরা বের হয়ে আসলে ই'তিমাদুদ্দৌলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

–কেমন দেখলেন খুতবা ও নামায?

আমি বললাম–খুতবার ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু নামায সম্পর্কে আমি স্পষ্ট প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ইসলামে স্বীকৃত চার মযহাবের নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি এতে। শাহের উচিত এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা।

তিনি শাহকে একথা বললেন। শাহ তা শুনে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। তিনি ই'তিমাদের দ্বারা আমাকে বলে পাঠালেন যে, তিনি অনতিবিলম্বে সকল বিরোধের নিস্পত্তি করবেন।

শুক্রবার বিকেলেই আমি মোল্লা বাশীর সংগে একান্ত বৈঠকে মিলিত হলাম। জা'ফরিয়া মযহাব সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করলাম। এক পর্যায়ে আমি বললাম, যে মযহাব অনুযায়ী আপনারা ইবাদত করছেন তার ভিত্তি ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত–এর পশ্চাতে কোন মুজতাহিদের ইজতিহাদ নেই।

তিনি বললেন–এটাই ইমাম জা'ফর সাদেকের মযহাব। আমি বললাম–আপনাদের এ মযহাবের সাথে জা'ফর সাদেকের কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে জা'ফর সাদেকের মযহাব কী তা আপনারা জানেনই না। আপনারা যদি বলতে চান যে, জা'ফর সাদেকের মযহাবের মধ্যে 'তাকিইয়া' রয়েছে, তাহলে আপনাদের একথা মানতেই হবে যে, এ তাকিইয়া আংশিকও হতে পারে অথবা পুরো মযহাবটাই তাকিইয়া ভিত্তিক হতে পারে। যদি শেষোক্ত সম্ভাবনাটি সত্যি হয়, আর তা হতেই পারে, তবে তাঁর মযহাবের অস্তিত্বই সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। আপনাদের মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি যে, কূপে পতিত নাপাকীর ব্যাপারে তাঁর তিনটি মত রয়েছে। এক,কূপতো সমুদ্রের অংশ, কোনকিছুই তাকে নাপাক করেনা। দুই, নাপাক বস্তুটি উঠিয়ে নিলেই চলবে। তিন, কূপ থেকে সাত বালতি পানি তুলে নিলেই হবে। এ সম্পর্কে আপনাদের কোন একজন আলেমকে আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ

–পরস্পর বিরোধী এ তিনটি বক্তব্যর মধ্যে আপনারা কিভাবে সমন্বয় করেন? তিনি বললেন–আমাদের মধ্যে যাঁর ইজতিহাদ করার ক্ষমতা রয়েছে তিনি ইজতিহাদ করে যেকোন একটি মতকে সঠিক বলে গ্রহণ করেন।

আমি বললাম–অপর দু'টো মত সম্পর্কে তিনি কী বলবেন?

তিনি বললেন–বলবেন যে, ও দু'টো তাঁর তাকিইয়া ছিল।

আমি বললাম–যদি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ইজতিহাদ করে অন্য কোন মতকে সঠিক মনে করেন তবে তিনি প্রথম ব্যক্তির গৃহীত মত সম্পর্কে কী

তিনি বললেন–বলবেন যে, সেটি ছিল তাকিইয়া।

আমি বললাম–তবে জা'ফর সাদেকের মযহাব বলতে আর কোন কিছু রইলনা। কারণ, তাঁর যেকোন বক্তব্য এবং যেকোন অভিমতেরই তাকিইয়া হবার সম্ভবনা রয়েছে। এজন্য যে, এমন কোন প্রমাণ নেই যার দ্বারা কোনটি তাকিইয়া আর কোনটি

তাকিইয়া নয় তার মধ্যে পার্থক্য করা যায়। এরপর সেই আলেম আর কোন জবাব দিতে পারেন নি। আপনার কাছে এর কোন জবাব রয়েছে কি?

তাঁর নীরবতা দেখে যখন বুঝতে পারলাম যে, তিনিও এর উত্তর দিতে অপারগ তখন আমি বললাম–আপনি যদি বলেন যে, জা'ফর সাদেকের মযহাবে কোন তাকিইয়া নেই তবে আমি বলব আপনাদের মযহাব আদৌ তাঁর মযহাব নয়। কেননা, আপনারা সকলেই তাকিইয়া নীতিতে বিশ্বাসী।

এরপরও যখন মোল্লা বাশী আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে চুপ রইলেন তখন আমি তাঁর সামনে আরো এমন কিছু দলিল–প্রমাণ পেশ করলাম যেগুলোর মাধ্যমে নিঃসন্দেহে একথা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা যে মযহাবে বিশ্বাসী সেটি আদৌ জা'ফর সাদেকের মযহাব নয়।

অতঃপর নাদির শাহ আমাকে বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করার অনুমতি দিলেন। বিদায়ের সময় আমাকে তিনি অংগীকারনামা ও জুমআর খুতবার একটি কপি প্রদান করলেন। ঐতিহাসিক এ ঘটনার জন্যই আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে আমি হজ্জের সংকল্প করলাম। আল্লাহ তুমি আমার কাজটি সহজ করে দাও। আমীন।

আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াত

ইসলামের প্রারম্ভ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজ বরাবর 'আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াত' নিয়েই গঠিত হয়ে এসেছে। এঁরাই এঁদের দ্বীনকে গ্রহণ করেছেন প্রথমতঃ আল্লাহর কিতাব আল–কুরআন থেকে, ঠিক যেমনটি সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও সলফে সালেহীন অনুধাবন করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ রসূলের সুন্নাহ ও হাদীস থেকে, যেগুলো বিশ্বস্ত ইমামগণের দ্বারা পরিশীলিত, পরিমার্জিত ও সংশোধিত হয়ে অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও সর্তকতার সংগে সংকলিত হয়েছে হাদীসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে। এসব গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুয়াত্তা–ই–ইমাম মালেক, সুনানে তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মসনদে ইমাম আহমদ ইত্যাদি। হাদীসের এসব কিতাবে সংকলিত হাদীসসমূহ বিশুদ্ধতা, গুরুত্ব ও সূত্রের দিক থেকে সমমানের না হলেও এগুলোই যে উম্মাহর সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের ভান্ডার তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের আইম্মা ও মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীস রিওয়ায়েত, হাদীসের শ্রেণীবিন্যাস ও বিশ্বাসযোগ্যতা নির্দ্ধারণের জন্য শর্তাবলী, বিধিবিধান ও পদ্ধতি তৈরী করেন এবং এসব বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। গুরুত্ব ও ব্যাপকতার বিচারে এগুলো শরীয়াহ বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখায় পরিণত হয় এবং তা এলমে সুন্নাহ বা হাদীস শাস্ত্র নাম পরিগ্রহ করে। আহলে সুন্নাহ তাঁরাই যারা তাদের দ্বীনকে গ্রহণ করেছে আল্লাহর কিতাব, রসুলের সুন্নাহ, উম্মতের ইজমা এবং আইম্মা–ই–কেরামের ইজতিহাদ থেকে। যেহেতু তারা আল–কুরআনের পর রসূলের সুন্নাহর অনুসারী এবং মুসলমানদের জমায়াত বা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, তাই তাদের 'আহলে সুন্নাহ ওয়াল জমায়াত' বলা হয়।

অপরদিকে, মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ এমন অনেক দলও রয়েছে যারা রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সুন্নাহ বা হাদীসের উপর ততটা গুরুত্ব প্রদান করেনা। কিন্তু আহলে সুন্নাহর মত তারাও কাবা শরীফকে কিবলা মানে, নামায পড়ে, যাকাত দেয়, রোযা রাখে ও হজ্জ করে। এদের মধ্যে আহলে সুন্নাহর নিকটবর্তী হল তুলনামূলকভাবে প্রথমতঃ 'যায়দিয়া' তারপর 'ইবাদিয়া' অতঃপর 'শিয়া ইমামিয়া ইসনা আশরিয়া'। এরপর উল্লেখ করা যায় 'বাতেনিয়া' সম্প্রদায়সমূহের কথা, যারা

বাহ্যতঃ ইসলামের নাম ব্যবহার করলেও আহলে কিবলার আওতায় পড়েনা। এদের মধ্যে রয়েছে বোহরা ইসমাইলিয়া, আগাখানী ইসমাইলিয়া, নাসীরিয়া, দ্রুজ ইত্যাদি। প্রকাশ্যে ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করলেও ধর্মের ব্যাপারে এদের রয়েছে স্বতন্ত্র আকীদা– বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান। 'বাবিয়া' এবং 'বাহাইয়া' সম্প্রদায়কেও এদের কাতারে শামিল করা যেত যদি না তারা নিজেরাই নিজেরদেকে ইসলাম থেকে আলাদা ধরে নিত। প্রকৃতপক্ষে বাবিয়া, বাহাইয়া ও গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওয়তে বিশ্বাসী কাদিয়ানীরা নিজেদের জন্য আলাদা আলাদা ধর্ম তৈরি করে নিয়েছে এবং এভাবে তারা ইসলামের গন্ডী থেকে বের হয়ে গেছে।

আহলে সুন্নাহ ও শিয়াদের মধ্যে অন্যতম প্রধান মৌলিক পার্থক্য এইযে, সুন্নীরা একমাত্র আল্লাহর রসূলকেই শরীয়তের উৎস এবং একমাত্র তাঁকেই মাসুম বা নিষ্পাপ বলে বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে ইসনা আশারী শিয়ারা মনে করে যে, শরীয়তের উৎস হলেন হযরত আলী (রাঃ) ও তাঁর বংশের এগারজন ইমাম এবং দাবী করে যে, তাঁরা সকলেই নিষ্পাপ ছিলেন। আমাদের ও তাদের মধ্যে আরেকটি মৌলিক পার্থক্য এইযে, আমরা বিশ্বাস করি, নবীর নিকট থেকে শরীয়ত আমাদের নিকট পৌঁছায় নেক, বিশ্বস্ত, সত্যবাদী ও ইসলামের জন্য আত্মত্যাগকারী সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে–তাবেয়ীনের মাধ্যমে এবং সাহাবায়ে কেরাম সকলেই সৎ, বিশ্বস্ত ও মহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বস্তুতঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) এ তিনটি যুগকে 'খায়রুল কুরুণ' বা সর্বোত্তম যুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের আল–কুরআনে 'খায়রুল উম্মাহ' বা সর্বোত্তম মানবগোষ্ঠী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আল–কুরআনের বহুসংখ্যক স্থানে আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহর সংগী–সাথীদের উচ্চ প্রশংসা করেছেন, তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। আমরা যে আজ সত্যধর্ম ইসলামের অনুসারী হতে পেরেছি, একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসেবে বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি, পৃথিবীর মহাদেশগুলোতে যে আজ ইসলামের বিজয় কেতন উড়ছে–সবই হচ্ছে সাহাবীদের মেহনত, জিহাদ ও আত্মোৎসর্গের ফল। তাঁরা যদি তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে না যেতেন তবে আমরা এবং শিয়ারা সকলেই আজ থাকতাম যে তিমিরে সেই তিমিরেই–পরিচয়হীন, স্বাতন্ত্রহীন, স্বাধীনতাহীন এক পদানত জনগোষ্ঠী লিপ্ত থাকতে হত জীবন ধারণের সংগ্রামে। যে সাহাবীগণ জীবনপণ সংগ্রাম করে গেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জনপদকে ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসার জন্য আমাদের নিকট যেমন তাঁদের প্রাপ্য অশেষ কৃতজ্ঞতা তেমনি আল্লাহর নিকট প্রাপ্য সীমাহীন পুরস্কার। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের এ নেক কাজের পুরস্কার পেতে থাকবেন।

এই হল সুন্নীদের বিশ্বাস। আমরা বিশ্বাস করি যে, সাহাবায়ে কেরাম সকলেই ছিলেন ভাই ভাই। পারস্পরিক স্নেহ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ। হযরত আলী এবং তাঁর ভাই আবু বকর, ওমর, ওসমান, আবু ওবায়দা, সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস, তালহা, যুবাইর প্রমুখ সকলেই ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু। একের মনে অপরের সম্পর্কে কোন বিদ্বেষ ছিলনা। সাধারণ সাহাবীদের মত হযরত আলীও প্রথমতঃ হযরত আবু বকর, অতঃপর হযরত ওমর এবং তারপর হযরত ওসমানের খিলাফতের বয়আত করেছিলেন। তাঁদের প্রতি তাঁর ভালবাসাও অত্যন্ত বেশি। তাই তিনি তাঁদের নাম অনুসারে আপন সন্তানদের নাম রেখেছিলেন, তাঁদের সংগে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁদের শাসনকার্যে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন। ঘেরাওকারী বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য আপন কলিজার টুকরা বীর পুত্রদ্বয় হাসান ও হুসায়নকে হযরত ওসমানের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন নিজেদের জীবনের বিনিময়ে হলেও খলীফার জীবন রক্ষার্থে বিদ্রোহীদের উপর তরবারি পরিচালনা করতে। তাঁরা তাই করতেন যদি না হযরত ওসমান খলীফা হিসেবে তাঁদের মুসলমানদের রক্তপাত করা থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে প্রবেশদ্বারে দন্ডায়মান যুবক হাসান ও হুসায়নকে দৃঢ়ভাবে বলে দিয়েছিলেন যে, তাঁর জীবন রক্ষার্থে কোন বিদ্রোহীকে হত্যা করা যাবেনা এবং তাঁদের নানাজীর সুসংবাদ অনুযায়ী তিনি শাহাদাত ও জান্নাতের জন্য অপেক্ষা করছেন। এখানে প্রশ্ন করা যায়, শত্রুর জীবনকে রক্ষা করার জন্য কি কেউ আপন যুবক পুত্রদ্বয়ের জীবন বাজী রাখতে পারে?

অপরদিকে শিয়াদের এ ধারণা যে, পাঁচজন ছাড়া অন্য সকল সাহাবী কাফের হয়ে গেছেন, প্রকাশ্য কুফরী ও জঘন্য মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। শিয়াদের এ বিশ্বাস যে, হযরত আলী ও তাঁর ১১ জন বংশধর মা'সুম ছিলেন এবং শরীয়ত তাই যা তারা পেয়েছে তাদের ইমামদের তথাকথিত কতিপয় ভক্ত, শিষ্য ও মুরীদের মাধ্যমে, তাও সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও কুরআন–হাদীসের সম্পূর্ণ খেলাফ। তাছাড়া ইমামগণ নিজেরাও কখনো অনুরূপ দাবী করেননি। যে ইসলাম আমরা জ'মহুর সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে পেয়েছি সে ইসলামে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেনা এবং যারা মনে করে যে, সাহাবীদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা–বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব–কলহ ও বৈরিতা বিদ্যমান ছিল তারা প্রকৃতপক্ষে আল–কুরআনকে মিথ্যা জানে, রসূলুল্লাহকে কষ্ট দেয় ও হযরত আলীর চরিত্রের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে।

শিয়াদের এ ধারণা যে, হযরত আলীর খিলাফত ছাড়া তাঁর পূর্বের ও পরের সব খিলাফত বা শাসনব্যবস্থা ছিল অবৈধ, সকল খলীফাই ছিলেন জবরদখলকারী এবং খিলাফত বা শাসন ক্ষমতা একমাত্র আহলে বাইতের হক, যুক্তি ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ ভ্রান্ত ধারণা কেবল কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধানেরই বিরোধী নয় বরং এটা ইসলামের দেড় হাজার বছরের গৌরবময় ইতিহাস, বিশ্বসভ্যতায় ইসলামের মহান অবদান এবং মুসলমানদের মহান ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করার শামিল। এ যেন ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দেবার ব্যর্থ প্রয়াস।

আহলে সুন্নাহ ও শিয়াদের মধ্যে বিদ্যমান মৌলিক এসব পার্থক্যের আলোকে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, উভয়ের মধ্যে মিল এতটুকু যে, সুন্নীরা যে ইসলামের অনুসারী শিয়ারাও সেই একই ইসলামের নাম ব্যবহার করে এবং সাধারণভাবে এরই আনুগত্য ঘোষণা করে। সব কিছু সত্ত্বেও যেসব ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে ঐক্যমত রয়েছে সে সব ক্ষেত্রে শিয়াদের সাথে সহযোগিতার নীতি অনুরসরণ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্পর্ক স্থাপনে সুন্নীদের কোন আপত্তি নেই। তবে শর্ত এইযে, যে সব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে সে সব বিষয়ে একে অপরকে ক্ষমার্হ মনে করবে এবং আঘাত করার পথ পরিহার করে চলবে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আহলে সুন্নাহর নীতি ও কর্মই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অনুকূল। কারণ, শিয়াদের নির্দোষ ইমামগণকে গালি দেওয়া, তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ও অভিশাপ প্রেরণ করা আমাদের কর্ম নয়। বরং শিয়াদের মত আমরাও তাঁদের ভালবাসি, ভক্তি করি এবং তাঁদের সচ্চরিত্রতা ও সুকৃতির প্রশংসা করি। পক্ষান্তরে সাধারণ ও বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের প্রতি শিয়াদের দৃষ্টিভংগি ও আচরণ সম্পূর্ণ নেতিবাচক, বৈরিভাবাপন্ন ও সমঝোতার পরিপন্থী।

পারস্পরিক পরিচিতি, সদিচ্ছা ও সহযোগিতা প্রকৃতপক্ষে সকলের জন্যই কল্যাণকর। এ নিবন্ধের রচয়িতা বিগত চল্লিশ বছর যাবৎ এ পরিচিতি, সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দিকে আহবান জানিয়ে আসছে। অতঃপর শিয়াদের মধ্যে কতিপয় প্রচারক গজিয়ে উঠে এবং ইরান থেকে মিসরে এসে তারা তথাকথিত শিয়া–সুন্নী নৈকট্যের দিকে সুন্নীদের আহবান জানাতে শুরু করে। তাদের প্রচার কার্যের ক্ষেত্র, ধরণ ও উদ্দেশ্য দেখে গোড়াতেই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়েছে যে, তাদের আসল উদ্দেশ্য শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে ঐক্য বা নৈকট্য স্থাপন নয়, বরং সুন্নীদের তাদের অবস্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে শিয়াদের কাতারে শামিল করে দেয়া।

এজন্যই তারা কর্মক্ষেত্র হিসেবে সুন্নী দেশগুলোকে বেছে নিয়েছে। সযত্নে তাদের নিজেদের দেশকে এ ঐক্য আন্দোলনের গন্ডী থেকে মুক্ত রেখেছে এবং শন্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিষয়টি, প্রকৃতপক্ষে যা কাম্য, এড়িয়ে গিয়ে অত্যন্ত চাতুর্যের সংগে মযহাবী নৈকট্যের শ্লোগান দিচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জমায়াহ এবং ইমামিয়া শিয়া মযহাবের মধ্যে নৈকট্য প্রতিষ্ঠা সম্ভবও নয়– যুক্তিযুক্তও নয়। গোঁজামিল জাতীয় যদি অনুরূপ কিছু ঘটেও তবে তা নতুন এক সমস্যার সৃষ্টি করবে। কারণ, মযহাবদ্বয়ের প্রতিটিরই রয়েছে স্বতন্ত্র মূলনীতি ও আকীদা বিশ্বাস। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান ও মৌলিক বিরোধ। এমতাবস্থায় নৈকট্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হল, উভয় পক্ষই তাদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে একটু সরে আসবে এবং এক পক্ষ অপর পক্ষকে কিছুটা ছাড় দিবে। কিন্তু শিয়া প্রচারকদের মনোভাব ও কর্মপন্থা দেখে মনে হয়না যে তারা এ পারস্পরিক দেয়া নেয়ার ভিত্তিতে এগিয়ে আসতে আগ্রহী। অতঃপর যে দ'ুটো বিকল্প হাতে থাকে তন্মধ্যে একটি হল, আহলে সুন্নাহর তাদের অবস্থান থেকে সরে আসা, অপরটি হল, উভয়টির সমন্বয়ে তৃতীয় একটি মযহাব তৈরি করা। বলা বাহুল্য, এটি হবে ইসলামের নতুন ফিতনা। এ ফিতনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জমায়াতের মৌলিকতার ও বিশূদ্ধতার বিলুপ্তি। অথচ রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জমায়াতই হচ্ছে তাঁর সাহাবীদের আদর্শ অনুসরণকারী এবং আখিরাতে নাজাত লাভকারী একমাত্র মিল্লাত।

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليأتين على أمتى كما أتى على بنى اسرائيل حذو النعل بالنعل حتى ان كان منهم من أتى أمه علانية لكان فى أمتى من يصنع ذلك وان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار الا ملة واحدة قالوا من هى يارسول الله قال : ما انا عليه واصحابى، رواه الترمذى وفى رواية أحمد وأبى داؤد عن معاوية ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعة وانه سيخرج فى أمتى أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله (مشكوة المصابيح)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ বনী ইসরাইলে যা ঘটেছিল আমার উম্মতেও ঠিক তাই ঘটবে, যেমন এক পায়ের জুতা অন্য পায়ের জুতার সংগে মিলে যায়। এমনকি যদি তাদের মধ্যে এমন কেউ থেকে থাকে যে নিজের মায়ের সাথে প্রকাশ্যে কুকর্মে লিপ্ত হয়েছিল তাহলে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন ব্যক্তি হবে যে অনুরূপ কাজ করবে। এছাড়া বনী ইসরাইল বিভক্ত হয়েছিল ৭২ (বাহাত্তর) দলে, আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ (তিয়াত্তর) দলে। এদের সকল দলই জাহান্নামে প্রবেশ করবে একটি মাত্র দল ব্যতীত। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ হুজুর, সেটি কোন দল? হুজুর বললেনঃ যে দল আমি ও আমার সাহাবীগণ যে পথে আছি সে পথে থাকবে।

ইমাম তিরমিযী এরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদ হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হতে রিওয়ায়েত করেন যে, বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে, আর একদল জান্নাতে–এটাই হচ্ছে 'জমায়াত'। আমার উম্মতের মধ্যে এমনসব লোক দেখা দিবে যাদের সর্বশরীরে কুপ্রবৃত্তি সমূহ এমনভাবে অনুপ্রবেশ করবে যেভাবে জলাতঙ্ক রোগ আক্রান্ত ব্যক্তির সর্বশরীরে মিশে যায়। তার দেহের কোন শিরা বা গ্রন্থি থাকেনা যাতে এটা সঞ্চারিত হয় না। (মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈমান)।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ফকীহ মোল্লা আলী কারী (রঃ) বলেন, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, নাজাতলাভকারী মিল্লাত বলে এখানে আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াতকে বুঝানো হয়েছে। (শরহে মিশকাত, প্রথম খন্ড, শরহে মাওয়াকিফ, শরহে আকাইদে নসফী ইত্যাদি)। সাধারণভাবে বলা যায় যে, যারা নবী করীম (সঃ), খুলাফায়ে রাশেদীন ও জমহুর সাহাবায়ে কেরামের তরীকা ও আদর্শে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে ও তা অনুসরণ করে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াত বলা হয়।

উপরোক্ত হাদীসে 'আমার উম্মত' বলে যারা রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর রিসালতে বিশ্বাসী এবং যারা নিজেদেরকে তাঁর উম্মত বলে দাবী করে ও কা'বার দিক হয়ে নামায পড়ে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। এরূপ লোকেরা পরবর্তীকালে বিভিন্ন দল–উপদলে বিভক্ত হয়ে সর্বমোট তিয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। আল্লামা শেখ আহমদ মোল্লা জিয়নের মত অনুযায়ী মূল বাতিল দলের সংখ্যা ছয়টি (১) শিয়া (২) খারেজী (৩) কাদরিয়া বা মু'তাজিলা (৪) জাবরিয়া (৫) মুরজিয়া ও (৬) মোশাব্বিহা। এগুলো আবার বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যথা– শিয়া ৩২ দলে, খারেজী ১৫ দলে, মু'তাজিলা ১২ দলে, মুরজিয়া ৫ দলে, জাবরিয়া ৩ দলে এবং মুশাব্বিহা ৫

দলে–মোট ৭২ দলে। এর সংগে ফিরকায়ে নাজিয়া বা নাজাতলাভকারী দল 'আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াতকে' যোগ করলেই সর্বমোট ৭৩ দল হয়ে যায়।

এ হাদীসে ফিরকা বলতে আকীদা বা বিশ্বাস ভিত্তিক দলকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ, আকীদা বা বিশ্বাসই হল ইসলামের মূল ভিত্তি। তাই বলা যায়, হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী প্রভৃতি কোন ফিরকার নাম নয় বরং এগুলো আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াতের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন ফিকহী ইজতিহাদ পদ্ধতির নাম। এদের সকলের আকীদাই মূলতঃ এক ও অভিন্ন। এদের মধ্যকার মতভেদ কেবল বিভিন্ন 'ইবাদত' (অযু, গোসল, নামায ইত্যাদি) আদায় করার পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্যেক দলই নিজেরদেরকে ফিরকা–ই–নাজিয়া বলে দাবি করে থাকে। কিন্তু নিছক কারো দাবীই সাফল্য ও মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য যুক্তি ও দলীল প্রমাণের প্রয়োজন। দ্বীন সম্পর্কিত যে কোন যুক্তির ভিত্তি হচ্ছে কুরআন ও হাদীস, কেবল বিবেক–বুদ্ধি নয়। পরস্পর বিরোধী এসব দাবীর কথা বাদ দিয়ে কেউ যদি কুরআন হাদীসকে সামনে রেখে নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন তবে তিনি দেখতে পাবেন যে, আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াতই সেই ফিরকা–ই নাজিয়া। এদের আকীদাই কুরআন–হাদীসের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এরা যে সত্যের উপর রয়েছে একথা প্রমাণ করার জন্য কুরআনের কোন আয়াতেরই অপব্যাখ্যা করতে হয়না বা কোন মিথ্যা হাদীস তৈরী করতে হয় না। খুলাফায়ে রাশেদীন, আশারায়ে মুবাশশারা, জমহুর সাহাবা, হাদীস ও ফিকাহর সকল ইমাম এবং মুসলমানদের প্রখ্যাত উলামা–মাশায়েখ, মুজতাহিদীন ও সূফী–ওলী এই আকীদাই পোষণ করে গেছেন। ইসলামের বিগত ইতিহাসকে পর্যালোচনা করে দেখলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) তাঁর 'এহইয়াউল উলুম,' গ্রন্থে আহলে সুন্নার আকাইদ ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রসংগে তিনি বলেন, আহলুস সুন্নাহ একথাও বিশ্বাস করে থাকে যে, রসূলুল্লাহর উম্মতের মধ্যে সাহাবীগণই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। আর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তুলনামূলকভাবে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছেন যথাক্রমেঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক, ওমর ফারুক, ওসমান গণী ও হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ)। এঁরা খিলাফত লাভ করেছেন এ ক্রমানুসারেই। প্রকৃতপক্ষে খুলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবায়ে কেরামের রেখে যাওয়া পথই যে রসূলুল্লাহ কর্তৃক আনীত পথ একথা প্রমাণ করার জন্য আমাদের নিকট প্রচুর সংখ্যক সহীহ হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে নীচের হাদীসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

عن العرباض بن سارية قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا فقال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، رواه أحمد وابوداود والترمذى وابن ماجة (مشكوة المصابيح - كتاب الايمان)

ইরবাদ বিন সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায পড়ালেন। অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে এমন সুললিত ভাষায় ওয়ায করলেন যাতে চক্ষুসমূহ অশ্রুবর্ষণকারী এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হল। এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল, হুজুর এটা যেন বিদায় গ্রহণকারীর শেষ উপদেশ। আমাদের আরো কিছু উপদেশ দিন। তখন হুজুর (সঃ) বললেন, তোমাদের আমি আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি এবং শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি যদিও তিনি (ইমাম বা নেতা) হাবশী গোলাম হন। আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা অল্প দিনের মধ্যেই অনেক মতভেদ দেখতে পাবে, তখন তোমরা আমার সুন্নাহকে এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে এবং একে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। সাবধান, তোমরা (দ্বীনের ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাহর বাইরের) নতুন কথা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নতুন কথাই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই পথ ভ্রষ্টতা। ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা। (মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈমান)।

এ প্রসংগে এখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ বর্ণিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী একটি হাদীসের উল্লেখ করে আমরা আমাদের এ আলোচনার সমাপ্তি টানব।

عن عبد الله بن مسعود قال : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال : هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال : هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ، وقرأ وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه الاية - رواه أحمد والنسائى والدارمى - (مشكوة المصابيح - كتاب الايمان)

হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) বলেনঃ আমাদের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি সরল রেখা টানলেন এবং বললেন, "এটা আল্লাহর রাস্তা।" অতঃপর এর ডানে ও বামে আরো কতগুলি রেখা টানলেন এবং বললেনঃ "এগুলিও রাস্তা, তবে এগুলির প্রত্যেকটি রাস্তার উপরই একটি করে শয়তান দাঁড়িয়ে আছে। শয়তান লোকদেরকে এর দিকে আহবান করে।" অতঃপর তিনি (রসূলুল্লাহ) কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেনঃ "নিশ্চয়ই এটাই আমার সরল–সঠিক পথ। তোমরা এটাই অনুসরণ করবে এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ করবেনা। সেসব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে পৃথক করে দিবে।" রিওয়ায়েত করেছেন ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও দারেমী। (মিশকাতুল মাসাবীহ–কিতাবুল ঈমান)।

মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, সরল রেখা দ্বারা এখানে ইসলামের উপমা দেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য রেখা দ্বারা গুমরাহ মতবাদসমূহের ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহর রাস্তা মানুষকে নিয়ে যাবে জান্নাতের দিকে আর শয়তানের রাস্তা নিয়ে যাবে জাহান্নামের দিকে। কেউ কি আল্লাহর রাস্তা ও শয়তানের রাস্তার মধ্যে সমন্বয় সাধনের কথা কল্পনা করতে পারে? এও কি সম্ভব যে, পরস্পর বিপরীত দু'টি পথ কোনও স্থানে গিয়ে মিলে যাবে? যদি তা সম্ভব না হয় তবে আহলে সুন্নাহ ও শিয়া মযহাবের মধ্যে নৈকট্য ও ঐক্য স্থাপন সম্ভব হতে পারে কিভাবে?

উপরোল্লিখিত তিনটি হাদীস এক সংগে মিলিয়ে পড়লে দেকা যায় যে, সিরাতে মুস্তাকীম বা আল্লাহর পথ এবং রসূলের সুন্নাহ একই জিনিসের ভিন্ন নাম। আরো দেখা যায় যে, হাদীসগুলোতে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাহ বা আদর্শকে রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেরই সুন্নাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অন্য একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ

أُصحابي كالنّجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم -

"আমার সংগীরা তারকার মত, এঁদের মধ্যে তোমরা যারই অনুসরণ করবে হিদায়াত পেয়ে যাবে।"

একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাব যে, আল–কুরআনের বহু সংখ্যক আয়াত ও রসূলুল্লাহর হাদীসসমূহে হিদায়াত, নাজাত ও জান্নাত–এ তিনটি শব্দ বারংবার আবর্তিত ও উচ্চারিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজে আল্লাহ তাআলার নবী–রসূল প্রেরণ, আসমানী কিতাব নাযিল ও ইসলাম ধর্ম প্রদানের আসল উদ্দেশ্যকে এই তিনটি শব্দ দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায়। কেন আমরা কুরআনের শিক্ষা, রসূলের

কুরআন ও ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করব? নাজাত বা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য। তাতে আমাদের লাভ কী? আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব এবং চিরসুখে ও পরিপূর্ণ শান্তিতে কাটাব অনন্তকাল।

সম্মানিত পাঠক, এখন আপনি বলুন–হিদায়াত, নাজাত ও জান্নাতের বিনিময়ে কি আমরা কোন বাতিলের সংগে আপোষ করতে পারি? একমাত্র নাজাতলাভকারী মিল্লাত, আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াতের সরল–সঠিক পথ ছেড়ে দিয়ে কোন গোমরাহ ফিরকার সংগে ঐক্য স্থাপন করতে পারি? বাতিলের সাথে কি কোনদিন হকের সমঝোতা হয়? আল্লাহ আমাদের সকলকে আমাদের প্রিয় দ্বীনের উপর দৃঢ়ভাবে টিকে থাকার তওফীক দিন। আল্লাহুম্মা আমীন।